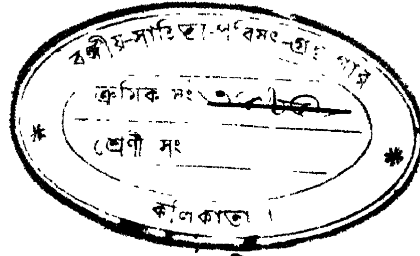
বৰ্দ্ধমানের ইতিকথা

(প্রাচীন ও আধুনিক)



শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব

সম্পাদিত



সূচী

১৮৮৮

ভূমিকা

যে বর্দ্ধমানে সাহিত্য-সম্মেলনের আয়োজন হইয়াছে—এই বর্দ্ধমান কত দিনের? কোন্ সময় হইতে বর্দ্ধমান নামকরণ হইয়াছে? বর্দ্ধমানের কোন্ অংশে সর্ব্বপ্রথম সভ্যতালোক প্রবেশ করে? কোন্ কোন্ স্থান প্রাচীন ও অতীত গৌরবের নিদর্শন? বর্ত্তমান সম্মেলনে তাহার একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিবার জন্য বর্দ্ধমানের অভ্যর্থনা-সমিতি আমার উপর ভারার্পণ করেন। আমিও সমিতির আহ্বান শিরোধার্য্য করিয়া প্রথমে বর্দ্ধমান জেলার পূর্ব্বাংশ পরিদর্শনে বাহির হই। কিন্তু যে যে স্থান দর্শন করিব আশা করিয়াছিলাম, দৈব বাধা-বিপত্তিতে ও সময়াভাবে তাহার অনেক স্থানই দেখিবার সুযোগ ঘটে নাই। নানা অন্তরায় ও বিপদের মধ্যে সমিতির আদেশ প্রতিপালন-উদ্দেশ্যে এই ক্ষুদ্র বিবরণী প্রকাশিত হইল। রাঢ়ভূমির হৃদয়স্বরূপ বর্দ্ধমান-ভূভাগের প্রকৃত পরিচয় দান এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অসম্ভব। সমগ্র বর্দ্ধমান-বিভাগ-পরিদর্শন,—বহুকালসাধ্য অতীত গৌরব-কীর্ত্তি রক্ষার আয়োজন, আমার বা এই অস্থায়ী সমিতির সাধ্যায়ত্ত নহে। সম্মুখে যে অনন্ত কার্য্যক্ষেত্র পড়িয়া আছে, আমাদের অতীত গৌরবের স্পর্দ্ধা করিবার নানা সম্পদ্ বর্দ্ধমানের নানা স্থানে যাহা বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, সেই সকলের পরিচয় দিতে হইলে রাঢ়বাসীর সমবেত উদ্যোগ আবশ্যক। এই মহান্ উদ্দেশ্য সুসাধনকল্পে রাঢ়-অনুসন্ধান-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অনুসন্ধান-সমিতির কার্য্য এখনও প্রকৃত প্রস্তাবে আরম্ভ হয় নাই। আমাদের সর্ব্বজন-মান্য অনুসন্ধান-সমিতির পৃষ্ঠপোষক বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর, আমাদের পূজ্যপাদ সভাপতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ও সমিতির অধিকাংশ সদস্যই বর্ত্তমান সম্মেলন-ব্যাপারে জড়িত আছেন। আশা করা যায়, সম্মেলন-উৎসব সুসম্পন্ন হইবার পরই অনুসন্ধান-সমিতি কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইবেন।

বর্ত্তমান সাহিত্য-সম্মেলনের অভ্যর্থনা-সমিতির উৎসাহে গত ৬ই ফাল্গুন হইতে ১৫ই ফাল্গুনের মধ্যে নিম্নলিখিত স্থানগুলি দর্শন করিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল—

কাঁটোয়া, দাঁইহাট, জগদানন্দপুর, অগ্রদ্বীপ, ঘোড়াইক্ষেত্র, বেগে, দেবগ্রাম, বিক্রমপুর, বিল্বেশ্বর, কুলাই, কেতুগ্রাম ও অট্টহাস। আমার পরিদর্শন-কার্য্য অতি সত্বর সমাধা করিবার অভিপ্রায়ে আমাদের রাঢ়-অনুসন্ধান-সমিতির পৃষ্ঠপোষক মাননীয় বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বিজয়চন্দ মহ্‌তাব্ বাহাদুর এবং অগ্রদ্বীপের জমিদার শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মল্লিক মহাশয় স্ব স্ব হস্তী দিয়া আমার এই কার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন প্রসূন-

সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ মহাশয় কুলাই, কেতুগ্রাম ও অট্টহাসে আমার সঙ্গে থাকিয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন এবং কাঁটোয়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমার এই অনুসন্ধান-কার্য্যে নানা ভাবে সাহায্য করিয়াছেন। এই সুযোগে আমি সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

সময়াভাবে অপরাপর বহু স্থান দর্শনের যেমন সুযোগ ঘটে নাই, যে যে স্থান পরিদর্শন করিয়াছি, তৎসম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবারও সুবিধা হয় নাই। যে বিবরণ মুদ্রিত হইল, তাহা অতি সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ পরিচয় বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে।

অভ্যর্থনা-সমিতির অভিপ্রায়ে শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় মহাশয়ের লিখিত 'বর্ত্তমান বর্দ্ধমান' শীর্ষক প্রবন্ধ এবং সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির 'উজানী ও মঙ্গলকোট' ও ৺অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারীর 'শূরনগর' প্রবন্ধের সারাংশ এই বিবরণীর সহিত প্রকাশিত হইল। অল্প দিনের উদ্যোগের ফল এই অসম্পূর্ণ বিবরণী পাঠ করিয়া কেহ যেন নিরুৎসাহ বা আমাদের উপর অসন্তুষ্ট না হন, ইহাই এই অধমের একান্ত প্রার্থনা।

বিশ্বকোষ-কুটীর
৯ কাঁটাপুকুর বাইলেন, বাগ্‌বাজার,
কলিকাতা।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু
১৫ই চৈত্র, ১৩২১।

বৰ্দ্ধমানের পুরাকথা

মার্কণ্ডেয়পুরাণে (৫৮।১৪) ভারতবর্ষরূপ কূর্ম্মের মুখদেশে তাম্রলিপ্ত ও একপাদপদেশের পরই বর্দ্ধমানের উল্লেখ আছে। বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতাতেও ভারতের পূর্ব্বদিকে তাম্রলিপ্তের সহিত এই বর্দ্ধমানের প্রসঙ্গ পাইতেছি।[১] এদিকে মহাভারতে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও পুণ্ড্রের সহিত সুহ্মের উল্লেখ আছে,[২] কিন্তু বর্দ্ধমানের উল্লেখ নাই। ভীমের পূর্ব্ব-দিগ্বিজয় উপলক্ষে সভাপর্ব্বে লিখিত আছে, 'পাণ্ডববীর (ভীম) মোদাগিরিস্থিত অতিবলশালী

বর্দ্ধমান নাম কত দিনের

রাজাকে মহাসমরে বাহুবলে নিহত করিলেন। পরে তীব্র-পরাক্রম ও মহাবাহু পুণ্ড্রাধিপ বাসুদেব এবং কৌশিকীকচ্ছ-নিবাসী রাজা মহৌজা এই দুই নৃপতিকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া বঙ্গরাজের প্রতি ধাবিত হইলেন। সমুদ্রসেন ও চন্দ্রসেন নরপতিকে পরাজয় করিয়া তাম্রলিপ্তরাজ, কর্ব্বটাধিপতি, সুহ্মাধিপতি ও সাগরবাসী ম্লেচ্ছগণকে জয় করিলেন।'[৩] কালিদাসের রঘুবংশে লিখিত আছে, 'জয়ী রঘু পূর্ব্বদিকে সমস্ত জনপদ আক্রমণ করিয়া মহাসাগরের তালীবনশ্যামল উপকূলে উপনীত হইলেন। সুহ্মগণ বেতলতার মত জড়সড় হইয়া উদ্ধতগণের উন্মূলনকারী রঘুর নিকট নত হইয়া আত্মরক্ষা করিলেন। পরে (রঘুবীর) নৌবলসম্পন্ন বঙ্গদেশীয় ভূপালগণকে বাহুবলে উৎখাত করিয়া গঙ্গাপ্রবাহ-মধ্যবর্ত্তী দ্বীপের উপর জয়স্তম্ভ সকল

---

(১) বৃহৎসংহিতা ১৪।৭, ১৬।৩।

(২) মহাভারত, আদিপর্ব্ব ১০৪ অঃ।

(৩) "অথ মোদাগিরৌ চৈব রাজানং বলবত্তরম্।
পাণ্ডবো বাহুবীর্য্যেণ নিজঘান মহামৃধে॥
ততঃ পুণ্ড্রাধিপং বীরং বাসুদেবং মহাবলম্।
কৌশিকীকচ্ছনিলয়ং রাজানঞ্চ মহৌজসম্॥
উভৌ বলভৃতৌ বীরাবুভৌ তীব্রপরাক্রমৌ।
নির্জ্জিত্যাজৌ মহারাজ বঙ্গরাজমুপাদ্রবৎ॥
সমুদ্রসেনং নির্জ্জিত্য চন্দ্রসেনঞ্চ পার্থিবম্।
তাম্রলিপ্তঞ্চ রাজানং কর্ব্বটাধিপতিং তথা॥
সুহ্মানামধিপঞ্চৈব যে চ সাগরবাসিনঃ।
সর্ব্বান্ ম্লেচ্ছগণাংশ্চৈব বিজিগ্যে ভরতর্ষভঃ॥"

(সভাপর্ব্ব ৩০।২১—২৪)

স্থাপন করিয়াছিলেন।'[৪] পতঞ্জলির মহাভাষ্যে 'বিষয়' শব্দের জনপদ অর্থ-প্রসঙ্গে অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্রের একত্র উল্লেখ দৃষ্ট হয়।[৫]

সিংহলের বৌদ্ধ ইতিহাস দীপবংশ ও মহাবংশ হইতে জানিতে পারি, বুদ্ধদেবের সমকালে লালের রাজধানী সিংহপুর হইতে বিজয় নির্ব্বাসিত হইয়া সমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছিলেন এবং তাঁহা হইতেই সিংহল সভ্যতালোকে আলোকিত হইয়াছিল।

জৈনদিগের সর্ব্বপ্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ আচারাঙ্গসূত্র পাঠে জানা যায়,—(২৪শ তীর্থঙ্কর মহাবীর বা) বৰ্দ্ধমানস্বামী 'লাঢ়'দেশে 'বজ্জভূমি' ও 'সুব্ভভূমি'র মধ্যে অতিকষ্টে ১২ বর্ষ কাটাইয়াছিলেন। তৎকালে বজ্জভূমিতে কুকুরের বড় উৎপাত ছিল। অনেক সন্ন্যাসী কুকুর তাড়াইবার জন্য দণ্ড লইয়া বেড়াইতেন। জৈন সূত্রকার লিখিয়াছেন যে, লাঢ়দেশে ভ্রমণ করা কঠিন।[৬] জৈনদিগের ৪র্থ উপাঙ্গ প্রজ্ঞাপনাসূত্রেও আর্য্য বা পুণ্যভূমিসমূহের মধ্যে কোটিবর্ষ ও রাঢ়দেশের উল্লেখ আছে।[৭]

জৈনদিগের সর্ব্বপ্রাচীন অঙ্গ আচারাঙ্গসূত্রে যে বজ্জভূমি ও সুব্ভভূমির উল্লেখ আছে, তাহাই আমাদের পুরাণে বৰ্দ্ধমান ও সুহ্ম নামে পরিচিত হইয়াছে এবং সেই সুপ্রাচীন কালে প্রায় খৃষ্টপূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে সুহ্ম ও বৰ্দ্ধমান রাঢ়দেশেরই অন্তর্গত ছিল। মহাভারত-টীকাকার নীলকণ্ঠ সুহ্মেরই অপর নাম 'রাঢ়' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।[৮] এদিকে মার্কণ্ডেয়-পুরাণ ও মহাভারতের শ্লোক একত্র পাঠ করিলে সুহ্ম ও বৰ্দ্ধমান অভিন্ন বলিয়াই যেন মনে হইবে। কিন্তু বরাহমিহির রাঢ়ের উল্লেখ না করিলেও সুহ্ম ও বৰ্দ্ধমান পৃথক্ ভাবেই উল্লেখ করিয়াছেন। উপরি উক্ত প্রমাণগুলি একত্র আলোচনা করিলে মনে হইবে যে, বরাহমিহিরের সময়ে যে স্থান সুহ্ম ও বৰ্দ্ধমান নামে পরিচিত ছিল, বৌদ্ধ ও জৈনগ্রন্থে সেই উভয় স্থানই

---

(৪) "পৌরস্ত্যানেবমাক্রামংস্তাংস্তান্ জনপদান্ জয়ী।
প্রাপ তালীবনশ্যামমুপকণ্ঠং মহোদধেঃ॥
অনম্রাণাং সমুদ্ধর্ত্তুস্তস্মাৎ সিন্ধুরয়াদিব।
আত্মা সংরক্ষিতঃ সুহ্মৈর্বৃত্তিমাশ্রিত্য বৈতসীম্॥
বঙ্গানুৎখায় তরসা নেতা নৌসাধনোদ্যতান্।
নিচখান জয়স্তম্ভান গঙ্গাস্রোতোহন্তরেষু সঃ॥"

(রঘুবংশ ৪,৩৪-৩৬)

(৫) "বিষয়াভিধানে জনপদে লুব্ বহুবচনবিষয়াদ্বক্তব্যঃ। অঙ্গানাং বিষয়ো দেশঃ অঙ্গাঃ। বঙ্গাঃ। সুহ্মাঃ। পুণ্ড্রাঃ।" (মহাভাষ্য ৪।২।১।)

(৬) আয়ারঙ্গসুত্ত ১।৮।৩।

(৭) "কোড়িবরিসং চ লাঢ়া"—পন্নবণা।

(৮) "সুহ্মাঃ রাঢ়াঃ"—মহাভারত, সভাপর্ব্ব ৩০।২৪ নীলকণ্ঠটীকা।

একত্র রাঢ় বলিয়া পরিচিত হইয়াছে,—তবে সুহ্ম নাম অপেক্ষাকৃত প্রাচীন বলিয়াই মনে হইবে। সুতরাং পূর্ব্বকালে সুহ্ম, রাঢ় ও বর্দ্ধমান বলিলে সময় সময় এক স্থানই বুঝাইত।

যাহা হউক, আমরা বুঝিতেছি যে, বর্দ্ধমান নামটী নিতান্ত আধুনিক নহে, খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীরও বহুপূর্ব্বে মার্কণ্ডেয়পুরাণের সময় হইতেই বর্দ্ধমান নাম প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। ২৪শ তীর্থঙ্কর বর্দ্ধমানস্বামী এখানে দ্বাদশ বর্ষকাল অতিবাহিত করায় জৈনসমাজে এই স্থান পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া সমাদৃত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ বর্দ্ধমানস্বামীর পুণ্য সমাগমে এই স্থান বর্দ্ধমান নামে পরে পরিচিত হইয়া থাকিবে।

বর্দ্ধমানের প্রাচীন ভূ-সংস্থান

আচারাঙ্গসূত্রের মতানুসারে বলিতে হয় যে, খৃষ্টপূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে রাঢ়দেশ বজ্রভূমি ও সুহ্ম এই দুই অংশে বিভক্ত ছিল, তৎপরে কিছুকাল এক হইয়া যায়। গুপ্ত-সম্রাট্গণের প্রভাব খর্ব্ব হইলে নানা সামন্তগণের স্বাধীনতা-গ্রহণের সহিত খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দী হইতে রাঢ়ের অন্তর্গত সুহ্ম ও বর্দ্ধমান আবার স্বতন্ত্র জনপদ বলিয়া গণ্য হইতে থাকে।

খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর দশকুমারচরিতে দামলিপ্তকে সুহ্মের অন্তর্গত[৯] বলা হইয়াছে, এ অবস্থায় বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলার কতকটা তৎকালে সুহ্ম বা রাঢ় বলিয়া পরিচিত ছিল। গঞ্জাম্ হইতে আবিষ্কৃত ২য় মাধবরাজের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, কোঙ্গোদপতি মাধবরাজ কর্ণসুবর্ণপতি শশাঙ্করাজকে আপনার অধীশ্বর বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। এ অবস্থায় বলিতে পারা যায় যে, কর্ণসুবর্ণ বা বর্দ্ধমানপতি শশাঙ্করাজের সময় সুহ্ম, তাম্রলিপ্ত[১০] ও উৎকল পর্য্যন্ত রাঢ়দেশ বিস্তৃত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, এই কারণেই সম্ভবতঃ দক্ষিণরাঢ়ের সুদূর দক্ষিণে অবস্থিত ময়ূরভঞ্জ অদ্যাপি অধিবাসিগণের নিকট রাঢ় বলিয়া পরিচিত।

খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে এই বর্দ্ধমান জেলায় যে স্থানে সাতশত ঘর ব্রাহ্মণের উপনিবেশ ছিল ও ব্রাহ্মণগণের আধিপত্য চলিত—সেই স্থানই সাতশতকা বা সাতশইকা পরগণা নামে পরিচিত। বলা বাহুল্য—রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ গৌড়াধিপপ্রদত্ত অধিকাংশ শাসন গ্রাম এই বর্দ্ধমান জেলায় লাভ করিয়া গ্রামীণ বা গ্রামাধিপ হইয়াছিলেন, অদ্যাপি তাঁহাদের বংশধরগণ তত্তৎগ্রামীণ বা গাঞী নামেই পরিচিত। খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতে এই স্থান বিভিন্ন রাজবংশের শাসনে ও সাম্প্রদায়িক বৈচিত্র্যে উত্তররাঢ় ও দক্ষিণরাঢ় এই দুই খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হয়। উত্তররাঢ়ের পালবংশের অধিকারে বৌদ্ধপ্রভাব, এবং দক্ষিণরাঢ়ে শূর ও দাস প্রভৃতি বংশের কর্ম্মনিষ্ঠতায় ব্রাহ্মণপ্রভাবের সন্ধান পাই। সম্ভবতঃ এই সাম্প্রদায়িক ও রাজনীতিক পার্থক্য হইতেই রাঢ়দেশের বিভিন্ন জাতির মধ্যে উত্তররাঢ়ীয় ও দক্ষিণরাঢ়ীয় শ্রেণীবিভাগ ঘটিয়াছিল।

---

(৯) দশকুমারচরিত, ৬ষ্ঠ উচ্ছ্বাস।

(১০) জৈনদিগের ৪র্থ উপাঙ্গ 'পন্নবণা' বা প্রজ্ঞাপনাসূত্রের মতে "তামলিপ্তি বঙ্গায়" অর্থাৎ বঙ্গের মধ্যে তাম্রলিপ্ত। এই প্রমাণে বলা যাইতে পারে যে, কোন সময়ে তাম্রলিপ্ত বঙ্গের মধ্যেও পরিগণিত হইত।

খৃষ্টীয় ৯ম হইতে ১১শ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ পাল, বর্ম্ম ও চন্দ্রবংশের শাসনে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বা পৌণ্ড্রভুক্তি, শ্রীনগরভুক্তি ও তীরভুক্তি এই তিনটী ভুক্তি বা Province এর উল্লেখ পাইয়াছি। খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ মহারাজ বল্লালসেনের সীতাহাটী-তাম্রশাসনে আমরা সর্ব্বপ্রথম বর্দ্ধমানভুক্তির সন্ধান পাই। এখন বর্দ্ধমান বিভাগ বলিলে যতটা বুঝায়, পূর্ব্বকালে ইহার অধিকাংশ বর্দ্ধমানভুক্তি নামে পরিচিত ছিল। তবে মহাভারত ও রঘুবংশ-রচনা-কালে বর্ত্তমান বর্দ্ধমান বিভাগের সর্ব্ব নিম্ন দক্ষিণ অংশের কতকটা সমুদ্রতরঙ্গ বিধৌত বা জাঙ্গলরূপে পরিগণিত ছিল, পূর্ব্বোদ্ধৃত ভীমের দিগ্বিজয় এবং রঘুর দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গ হইতে তাহার কিছু কিছু আভাস পাইতেছি।

আবার বল্লালপুত্র লক্ষ্মণসেনের সমকালে লিখিত ধোয়ী কবির 'পবনদূত' কাব্যে সুহ্মের মধ্যে লক্ষ্মণসেনের রাজধানী বিজয়পুর কীর্ত্তিত হইয়াছে। এ অবস্থায় সেনরাজবংশের রাজত্বকালে সুহ্ম বৰ্দ্ধমানভুক্তির মধ্যেই ছিল বলা যাইতে পারে। যাহা হউক উপরি উক্ত প্রমাণ হইতে বেশ বুঝিতেছি যে, বর্দ্ধমান নামটীও অতি প্রাচীন ও বহু পূর্ব্বকাল হইতেই একটী স্বতন্ত্র জনপদ বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে। তবে রাঢ় বলিলে তদপেক্ষা বৃহৎ জনপদও বুঝাইত। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর মধ্যভাগে মুসলমান ঐতিহাসিক মিন্‌হাজ লিখিয়া গিয়াছেন, "গঙ্গার দুই ধারে লখ্‌নৌতীরাজ্যের দুইটী পক্ষ, পূর্ব্বদিকে রাল (রাঢ়), এই ধারেই লখ্‌নোর নগর এবং পশ্চিম বরিন্দ (বরেন্দ্র) নামে খ্যাত, এই ধারেই দেওকোট নগর।" মিন্‌হাজের এই উক্তি হইতে মনে হয় বর্ত্তমান বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, সাঁওতাল পরগণা, ও হুগলী জেলা তৎকালে রাঢ়ের অন্তর্গত ছিল।

উপরে বৰ্দ্ধমানের যে সীমা দিলাম, তাহা ঠিক কতটা ছিল তাহা বলা কঠিন। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে রেনেল সাহেব যে বাঙ্গালার মানচিত্র প্রকাশ করেন, সেই মানচিত্রে বর্দ্ধমানের উত্তরে বীরভূম, দক্ষিণে মেদিনীপুর ও হুগলী জেলা, পূর্ব্বে হুগলী, কৃষ্ণনগর ও রাজসাহী জেলা এবং পশ্চিমে পঞ্চকোট, বিষ্ণুপুর ও মেদিনীপুর জেলা পড়িয়াছিল। কিন্তু তাহারও পূর্ব্বে রচিত—ভবিষ্য-ব্রহ্মখণ্ড[১১] নামক গ্রন্থে লিখিত আছে—'পুণ্ড্রদেশ সপ্ত প্রদেশে বিভক্ত—গৌড়, বরেন্দ্র, নিবৃত্তি, নারীখণ্ড, বরাহভূমি, বর্দ্ধমান ও বিন্ধ্যপার্শ্ব। ইহার মধ্যে বৰ্দ্ধমান মণ্ডল ২০ যোজন।'[১২] খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে রচিত দিগ্বিজয়-প্রকাশ নামক সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থের মতে—'অজয়নদের দক্ষিণভাগে, শিলাবতী নদীর উত্তরে, গঙ্গার পশ্চিমপারে এবং দারিকেশি নদীর পূর্ব্বে দৈর্ঘ্য ১১ যোজন ও প্রস্থে ৮ যোজন পরিমিত বর্দ্ধমান দেশ।'[১৩] 'ইহার মধ্যভাগে দামোদর প্রবাহিত হইতেছে, পূর্ব্বদিকে যে সমস্ত

বর্দ্ধমানের পূর্ব্ব আয়তন

---

(১১) হ হ উইলসন্ সাহেবের মতে এই গ্রন্থ ১৫৫০ খৃষ্টাব্দের পর রচিত হয়। Indian Antiquary, 1891. Vol XX. p. 419 দ্রষ্টব্য।

(১২) ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ড ৬।২।

(১৩) বিশ্বকোষ, ১৭শ ভাগ ৬১২-৬২৮ পৃষ্ঠায় মূল বচন দ্রষ্টব্য

নদী আছে, তন্মধ্যে মুণ্ডেশ্বরী, বকুলা ও সরস্বতী নদীই প্রধান। দক্ষিণেও বড় নদী আছে।' ব্রহ্মখণ্ডের মতে, 'বর্দ্ধমানের মধ্যে বহুসংখ্যক নগর ও গ্রাম আছে, তন্মধ্যে এই কয়টী প্রধান—খাটুল, দারিকেশিনদীর পার্শ্বে জানাবাদ, মায়াপুর, শঙ্কর-সরিৎপার্শ্বে গরিষ্ঠ গ্রাম, মুণ্ডেশ্বরীর নিকট শ্রীকৃষ্ণনগর (খানাকুল), এখানে অভিরামপ্রতিষ্ঠিত শ্যামসুন্দর, দামোদরের পার্শ্বে রাজবল্লভ, ভাগীরথীর পার্শ্বে বিদ্যাস্থান নবদ্বীপ—গৌরাঙ্গের জন্মস্থান, নালাজোর, একলক্ষক, রাঘববাটিকা, অম্বিকা, বালুগ্রাম, মীরগ্রাম, ভুরিশ্রেষ্ঠিক, সেনাপি, জনাগ্নি, স্ফুরণ, আঙ্কন, তট, স্বর্ণটীক, বৰ্দ্ধমানের দক্ষিণে পারুল, কুমারবীথিকা, কুলক্ষিপ্তা, কপল, লৌহপুর, গোবৰ্দ্ধন, হস্তিক, শ্রীরামপুর, বেলুন, অগ্রদ্বীপ, পাটলি, কর্ণগ্রাম, জোতিবনি, চন্দ্রপুর, বলিহারিপুর, বচ্ছিকবালা, কুশমান, গঙ্গচারি, জাবট, চন্দ্রলেশ ও জাঙ্গলের নিকট রসগ্রাম। এ ছাড়া ৮টী পত্তনের নাম যথা—বৈদ্যপুর, পাটলি, শিলাবতীনদীর পার্শ্বে লোহদা, দামোদরের নিকট চন্দ্র-বাটী, বৰ্দ্ধমানের পশ্চিমাংশে বৃশ্চিকপত্তন, ত্রিবক্রসরিৎপার্শ্বে হাটকনগর, ভাগীরথীর পশ্চিমে বিল্বপত্তন এবং বৰ্দ্ধমানের ত্রিশক্রোশ দূরে সামন্তপত্তন।'[১৪]

উদ্ধৃত গ্রাম ও নগরাদির অবস্থান আলোচনা করিলে বলিতে পারা যায় যে, খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বর্ত্তমান বৰ্দ্ধমান জেলা ব্যতীত বর্ত্তমান হাওড়া, হুগলী, নদীয়া, পাবনা, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া এবং মুর্শিদাবাদ জেলার কতকাংশ পূর্ব্বে বৰ্দ্ধমান প্রদেশের অন্তর্গত ছিল।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, জৈন আচারাঙ্গসূত্রের মধ্যে বজ্জভূমির পথে কুকুরের উৎপাত উল্লেখ পাইয়া কেহ কেহ বলিতে চান যে, ২৪শ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামীর সময় বজ্জভূমি বা বৰ্দ্ধমান জন-পদ বন্যজন্তুর বিহারক্ষেত্র ও অসভ্য লোকের বাসস্থান বলিয়াই গণ্য ছিল।

বৰ্দ্ধমানের সভ্যতা

বাস্তবিক সে সময় বৰ্দ্ধমান সেরূপ বন্য ও অসভ্য ছিল না। তাহার বহু পূর্ব্ব হইতেই এ অঞ্চলে উচ্চ সভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছিল এবং পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়বীরগণের বাস ছিল, কুরুক্ষেত্রের মহাসমরেও যে তাঁহারা স্ব স্ব বীর্য্যবত্তার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, মহাভারতেই তাহার বর্ণনা রহিয়াছে। মহাবীর স্বামীর সময়েই শাক্যবুদ্ধের আবির্ভাব। সিংহলের পালি-মহাবংশেই প্রকাশ যে, তৎকালে সিংহপুরে রাঢ়ের রাজধানী ছিল এবং তথায় সিংহবাহু রাজত্ব করিতেছিলেন। দুষ্কর্ম্মের জন্য তিনি আপন প্রিয়পুত্র বিজয়কে তাঁহার সাত শত অনুচরসহ নির্ব্বাসন করেন। তৎকালেও রাঢ়বাসী যে, সমুদ্রগামী নৌকা ব্যবহার করিতেন এবং মহা-সমুদ্রের ঊর্ম্মীমালা ভেদ করিয়া সমুদ্রান্তরে ভিন্ন দেশে যাতায়াত করিতে সমর্থ ছিলেন, ঐ মহা-বংশ হইতেই তাহার প্রমাণ পাইতেছি।

তৎকালে বৰ্দ্ধমান, রাঢ় বা সুহ্মপ্রদেশের পার্শ্ব ভূভাগ সমুদ্র-তরঙ্গ বিচুম্বিত ছিল। বৰ্দ্ধমানস্বামীর আগমনকালে যে স্থান বজ্জভূমি নামে পরিচিত ছিল, তাহাই মার্কণ্ডেয়-পুরাণে ও বরাহমিহিরের গ্রন্থে 'বৰ্দ্ধমান' নামে সম্ভবতঃ উল্লিখিত হইয়াছে। খৃষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ

---

(১৪) ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ড ৭ম অধ্যায়।

শতাব্দীতে গ্রীকরাজদূত মেগস্থিনিস্ Gangaridæ নামে একটী বৃহৎ ও সমৃদ্ধিশালী জনপদের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, 'যে বিস্তৃত জনপদের রাজধানী পাটলিপুত্র সেই প্রাচ্য জনপদের পূর্ব্বদিকে উক্ত 'গঙ্গারিডি' জনপদ।'[১৫] প্রাচীন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক দিওদোরস্ মেগস্থিনিসের দোহাই দিয়া লিখিয়াছেন,—'গঙ্গানদী গঙ্গারিডির পূর্ব্ব সীমা হইয়া সাগরে মিলিত হইয়াছে।' আবার প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য ভৌগোলিক টলেমীর মতে 'গঙ্গার মোহানার অদূরস্থিত প্রদেশে গঙ্গারিডিগণের বাস। এখানকার রাজা 'গঙ্গে' নগরে বাস করেন।'[১৬] সুপ্রাচীন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিকের উক্তি হইতে বেশ মনে হইবে যে, বর্ত্তমান ভাগীরথীর পশ্চিম কূল হইতে প্রাচীন মগধের পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত রাঢ়দেশই 'গঙ্গারিডি' নামে পরিচিত ছিল। প্লিনি লিখিয়াছেন,—'গঙ্গার শেষাংশ গঙ্গারিডি-কলিঙ্গির মধ্য দিয়া গিয়াছে।'[১৭] প্লিনির এই বর্ণনা হইতে মনে হয় যে, কলিঙ্গের উত্তরাংশ বা উৎকলের কতকটা তৎকালে রাঢ়দেশের অন্তর্গত ছিল। কাহারও মতে গঙ্গারাঢ়ী বা গঙ্গালীই গ্রীক্-ভাষায় গঙ্গারিডি হইয়াছে। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক দিওদোরাস্ বলিতেছেন,—'গঙ্গারিডিগণের অসংখ্য রণদুর্ম্মদ হস্তী থাকায় কখন কোন বিদেশীয় রাজা তাঁহাদিগকে পরাজয় করিতে পারে নাই। কারণ অপর দেশের লোকেরা সকলেই সেই হস্তীকে ভয় করে।' প্লিনি লিখিয়াছেন—'সর্ব্বদা ৬০০০০ পদাতি, ১০০০ অশ্বারোহী ও ৭০০ হস্তী সুসজ্জিত থাকিয়া সেই রাজ্যের নরপতির দেহরক্ষা করিতেছে। রাজধানীর নাম পর্থলিস্ বা পরতালিস্'। খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে পেরিপ্লস্ লিখিয়া গিয়াছেন যে, 'গঙ্গে বন্দর হইতে শ্রেষ্ঠ মস্‌লিন, প্রবাল, ও নানা দ্রব্য রপ্তানী হইত।' রোমের মহাকবি ভার্জ্জিল খৃষ্টপূর্ব্ব ১ম শতাব্দীতে উজ্জ্বল ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন, 'তিনি জন্মস্থানে ফিরিয়া যাইবেন, তথায় মর্ম্মরের একটী মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবেন, তন্মধ্যে রোমসম্রাটের মূর্ত্তি রাখিবেন,—মন্দিরের দ্বারদেশে স্বর্ণ ও গজদন্তের গঙ্গারিডিগণের অপূর্ব্ব যুদ্ধের চিত্র ও সম্রাট্ কুইরিনাশের লাঞ্ছন আঁকিবেন।'[১৮] সিংহলের কবি-ঐতিহাসিকের মহাবংশ ও গ্রীক ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা হইতে আমরা বেশ বুঝিতেছি যে, খৃষ্টপূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দী হইতে খৃষ্টপূর্ব্ব ১ম শতাব্দী পর্য্যন্ত রাঢ়দেশ সভ্যতার উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত ছিল।

বর্দ্ধমান বা রাঢ়ের প্রাচীন রাজধানী

সিংহলের মহাবংশে পাইতেছি যে, খৃষ্টপূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে 'সিংহপুর' নামক স্থানে রাল বা রাঢ়ের অধীশ্বর সিংহবাহু রাজত্ব করিতেন। তৎকালে এখানে সিংহের বড়ই উৎপাত ছিল, তাহা হইতে অথবা সিংহবাহুর বীর্য্যবত্তার পরিচয় দিবার জন্য মহাবংশকার রাঢ়াধীশ্বরকে সিংহীর দুগ্ধে প্রতিপালিত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। সেরগড়পরগণায় সিংহারণ নামে যে নদী আছে, কেহ কেহ মনে করেন ঐ

(১৫) McCrindle's Ancient India as described by Megasthenes and Arrian, p. 58.
(১৬) McCrindle's Ptolemy, p. 172.
(১৭) McCrindle's Megasthenes, p. 135.
(১৮) Georgics, III, 27.

নদীর তীরে সিংহপুর রাজধানী ছিল,—এখানে সিংহবাহু রাজত্ব করিতেন। সিংহপুর ধ্বংস হইলে এই স্থান 'সিংহারণ্য' নামে প্রসিদ্ধ হয়। এই সিংহারণ্য হইতেই 'সিংহারণ' নদীর নামকরণ হইয়া থাকিবে।

তৎপরে গ্রীক ও রোমকদিগের বিবরণী হইতে পাইতেছি যে, খৃষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ হইতে খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীর মধ্যে বর্দ্ধমানপ্রদেশে পরতালিস্ (Portalis), গঙ্গে (Gangai) ও কাটাদপা (Katadupa) নামে তিনটী প্রধান নগর বা বন্দর ছিল। ফরাসীপুরাবিদ্ সেণ্টমার্টিন বর্ত্তমান বর্দ্ধমান সহরকেই Parthalis বা Portalis স্থির করিয়াছেন। এই নামটী দেশীয় 'পরতাল' শব্দেরই বিকৃত রূপ বলিয়া মনে হয়। দিগ্বিজয়প্রকাশে সপ্তজাঙ্গলের বিবরণের পর বঙ্গাল-পরতালের প্রসঙ্গ আছে। এই প্রসঙ্গ অনুসরণ করিলে বলিতে হয় যে, বর্ত্তমান রাঢ় ও পূর্ব্ববঙ্গের মধ্যস্থলে 'পরতাল' বলিয়া কোন প্রসিদ্ধ স্থান ছিল এবং বিক্রমপুরে সেই পরতালরাজের প্রমোদভবন ছিল।[১৯] যদি দিগ্বিজয়প্রকাশের 'পরতাল' এবং গ্রীক ঐতিহাসিক-গণের Parthalis বা Portalis এক হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমান সহরকে Portalis বলিয়া ধরিয়া লইতে সন্দেহ হয়। যাহা হউক এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান আবশ্যক।

'গঙ্গে' বন্দর কোথায় ছিল, তাহা এখন স্থির করা কঠিন। তৎকালে যেখানে গঙ্গাসাগরসঙ্গম ছিল, সেই স্থানেই 'গঙ্গে' বন্দর হওয়া সম্ভবপর। কণ্টপদ্বীপ বা কাঁটাদীয়ার অপভ্রংশে 'কাটাদপা' হইয়া থাকিবে, এখন কাটোয়া নামেই পরিচিত।

খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে চীনপরিব্রাজক রাঢ়দেশে আগমন করেন। তিনি এখানকার সমৃদ্ধির কথা উজ্জ্বল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তৎকালে সুহ্ম, রাঢ় বা বর্দ্ধমানভুক্তি কর্ণসুবর্ণ নামে পরিচিত ছিল। তৎকালে এই স্থান বহু জনাকীর্ণ, বহু ধনকুবের ও বিদ্যানুরাগী জনগণের বসবাস ছিল। তৎকালে এখানকার রাজধানী কর্ণসুবর্ণে ১০টী মাত্র বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম, কিন্তু নানা সম্প্রদায়ের ৫০টী দেবমন্দির ছিল। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, এখানে বৌদ্ধসম্প্রদায় অপেক্ষা অপর সম্প্রদায়ের লোকই বেশী ছিল। তখনকার এই কর্ণসুবর্ণ বা রাঢ়ের রাজধানী লইয়া মত ভেদ আছে। কেহ বলেন, বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ জেলায় রাঙ্গামাটী বা কাণসোণা নামক স্থানে, আবার কেহ বলেন যে, বর্দ্ধমানের নিকটবর্ত্তী কাঞ্চন-নগরেই কর্ণসুবর্ণের প্রাচীন রাজধানী ছিল। বলা বাহুল্য এই দুইটী স্থানই এক সময়ে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ও রাঢ়ীয় সভ্যতার কেন্দ্র বলিয়া পরিচিত ছিল এবং এখনও উভয় স্থানেই সেই অতীত কীর্ত্তির নিদর্শন বিদ্যমান। উক্ত উভয় স্থান ব্যতীত এই বর্দ্ধমান জেলার মধ্যে সিংহারণ, প্রদ্যুম্নপুর, শূরনগর, মন্দারণ, ভুরসুট প্রভৃতি শত শত

---

(১৯) "বিদ্বজ্জনানাং বাসশ্চ বিক্রমপুর্য্যাশ্চ ভূরিশঃ।
পরতালভূমিপস্য তোষিস্থলং বিদুর্বুধাঃ॥" দিগ্বিজয়প্রকাশ ৯২)

স্থানে পূর্ব্ব-ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার যথেষ্ট নিদর্শন ছড়াইয়া রহিয়াছে। আশা করি, রাঢ়-অনুসন্ধান-সমিতি সেই সকল কীর্ত্তির তত্ত্বোদ্ধারে বিশেষ মনোযোগী হইবেন।

খৃষ্টীয় ৮ম ও ৯ম শতাব্দীতে সমগ্র রাঢ়দেশ শূরবংশীয় নৃপতিগণের অধিকারভুক্ত ছিল। তৎপরে পালরাজগণের প্রভাববিস্তারের সহিত তাঁহাদের অধিকারভুক্ত স্থান উত্তররাঢ় এবং শূর ও দাসবংশের অধিকারভুক্ত স্থান দক্ষিণরাঢ় নামে পরিচিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান বর্দ্ধমান জেলার উত্তরাংশে ও মুর্শিদাবাদ জেলায় অদ্যাপি উত্তররাঢ়ীয়দিগের আদি সমাজস্থান এবং বর্দ্ধমান জেলার দক্ষিণাংশে এবং হুগলী জেলা ও ২৪ পরগণার মধ্যে দক্ষিণরাঢ়ীয়দিগের সমাজস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। বর্দ্ধমানজেলাস্থ শূরনগর, প্রদ্যুম্নপুর ও গড়মন্দারণ নামক স্থানে বিভিন্ন শূররাজের এবং হুগলীজেলাস্থ ভূরসুট নামক স্থানে দাসবংশের ও তৎপরে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণরাজবংশের রাজধানীর চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, জৈনদিগের প্রজ্ঞাপনাসূত্র নামক উপাঙ্গে রাঢ়দেশ পুণ্যভূমি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। কল্পদ্রুমকালিকা নামে জৈন কল্পসূত্রের টীকায় পাওয়া যায় যে, মহাবীর স্বামী এখানকার কেবল সুসভ্য জাতি বলিয়া নহে, অসভ্য জাতিদিগের মধ্যেও ধর্ম্মালোক বিতরণ করিয়াছিলেন। এই বর্দ্ধমানস্বামীর পুণ্য-সংস্রবে সম্ভবতঃ অতি পূর্ব্বকাল হইতেই জৈনসমাজে বর্দ্ধমান পুণ্যভূমি বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

ধর্ম্মপ্রভাব

শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রভাবও রাঢ়দেশে অল্পদিন হয় নাই। বশিষ্ঠের সিদ্ধিস্থান তারাপীঠ ও কিরীটেশ্বরী বর্ত্তমান বর্দ্ধমান জেলার বাহিরে হইলেও বর্দ্ধমানভুক্তি বা রাঢ়দেশের মধ্যেই অবস্থিত। রাঢ় বা বর্দ্ধমানপ্রদেশ এক সময়ে শৈব ও শাক্তগণের লীলাস্থান বলিয়া গণ্য ছিল, তাহার কারণ ৫১টী পীঠের মধ্যে এই রাঢ়দেশেই ৯টী ডাকার্ণব পীঠ অবস্থিত। কুব্জিকাতন্ত্রের ৭ম পটলে কর্ণস্বর্ণ বা কর্ণসুবর্ণ, ক্ষীরগ্রাম, বৈদ্যনাথ, বিল্বক, কিরীট, অশ্বপ্রদ বা অশ্বতীর্থ, মঙ্গলকোট ও অট্টহাস এই আটটী সুপ্রাচীন সিদ্ধপীঠের উল্লেখ আছে। বলা বাহুল্য, মুসলমান-আগমনের বহু পূর্ব্ব হইতেই ঐ সকল স্থান প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।[২০] ঐ সকল স্থান বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিলে এখনও প্রাচীন কীর্ত্তির বহু নিদর্শন বাহির হইতে পারে।

আরও কত শাক্তস্থান আছে, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার উল্লেখ অসম্ভব। এইরূপ যে সকল শৈব-কীর্ত্তি আছে তন্মধ্যে বৈদ্যনাথ ও বক্রেশ্বর সর্ব্বপ্রাচীন ও প্রধান। এইরূপ ভক্তপ্রবর জয়দেবের লীলাস্থলী কেন্দুবিল্ব—বৈষ্ণবজগতে আজও প্রধান পুণ্যস্থান বলিয়া

---

(২০) তন্ত্রচূড়ামণি নামক পরবর্ত্তী সংগ্রহ গ্রন্থে (রাঢ়দেশের মধ্যে) বহুলা, উজানী, ক্ষীরখণ্ড, কিরীট, নলহাটী, বক্রেশ্বর, অট্টহাস ও নন্দিপুর এই ৯টীকে মহাপীঠ স্থান বলিয়া ধরা হইয়াছে। কিন্তু তৎপরে রচিত শিব-চরিতসংগ্রহ গ্রন্থে অট্টহাস, নলহাটী ও নন্দিপুর উপপীঠ মধ্যে গণ্য এবং তৎপরিবর্ত্তে সুগন্ধা, রত্নখণ্ড ও বক্রনাথ এই তিনটী মহাপীঠ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এরূপ মতভেদস্থলে অতিপ্রাচীন কুব্জিকাতন্ত্রের মতই গ্রহণীয়।

কীর্ত্তিত হইতেছে। রাঢ়দেশের প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই ধর্ম্মপূজার অল্প-বিস্তর প্রচার আছে। পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রীমহাশয় এই ধর্ম্মপূজাই বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ নিদর্শন বলিয়া বহুদিন প্রমাণ করিয়াছেন। তাহা অগ্রাহ্য করিবার উপায় নাই। মুসলমানপ্রভাবকালে সাধু ও ভক্তপ্রভাবে যে সকল অসংখ্য পীঠ ও পাটের উৎপত্তি হইয়াছে, এই সংক্ষিপ্ত পুরাতত্ত্ব মধ্যে সে সকলের আর উল্লেখ করিলাম না। "বর্ত্তমান বৰ্দ্ধমান" প্রসঙ্গে তাহার কিছু কিছু আলোচিত হইয়াছে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।



বর্ত্তমান বর্দ্ধমান

অবস্থান

বর্দ্ধমান জেলার পূর্ব্বে ভাগীরথী। ভাগীরথীর পশ্চিম-তীরে নবদ্বীপের চতুঃপার্শ্বস্থ কিঞ্চিৎ ভূভাগ ভিন্ন নদীয়া জেলার সমস্ত অংশ ভাগীরথীর পূর্ব্ব-তীরে অবস্থিত। দক্ষিণে হুগলী জেলা, পশ্চিমে বাঁকুড়া ও মানভূম। উত্তরে সাঁওতাল পরগণা, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ। পূর্ব্বের সীমা-রেখা যেমন ভাগীরথী, উত্তরে তেমনই কোন কোন স্থানে অজয় এবং পশ্চিমে দামোদর ও বরাকর।

আয়তন ও লোক-সংখ্যা

বর্দ্ধমান জেলার আয়তন ২৬৯১ বর্গ-মাইল। লোকসংখ্যা ১৫৩৮৩৭১। সদর, আসানশোল কাঁটোয়া ও কালনা এই চারিটি মহকুমা। ৬টি মিউনিসিপালিটি, ১৭টি থানা এবং ২৭৬৯ গ্রাম আছে। জেলার মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা ১২২০৫৫১ ও মুসলমানের সংখ্যা ২৯০৩৮১।

জেলার সমস্ত লোকের মধ্যে শতকরা ১০ জন শিক্ষিত। শিক্ষায় বাঙ্গলার জেলার মধ্যে বর্দ্ধমান ৪র্থ স্থান অধিকার করিয়াছে। সমস্ত বাঙ্গলায় শতকরা ৩·১ ইংরাজী শিক্ষিত, বর্দ্ধমান জেলায় ৩।

বর্দ্ধমান জেলায় ২৭টি উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয় আছে, তন্মধ্যে ৬টি বর্দ্ধমান নগরে। তদ্ভিন্ন বর্দ্ধমান নগরে একটি ২য় শ্রেণীর কলেজ ও একটি টেক্‌নিক্যাল স্কুল আছে।

বিভিন্ন জাতি

বর্দ্ধমান জেলায় ৯৪টি জাতি আছে। ইহার মধ্যে বাগ্‌দির সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ। ব্রাহ্মণ, বাউরি ও সদ্‌গোপদিগের সংখ্যা প্রত্যেকের এক লক্ষের অধিক। তদ্ভিন্ন উগ্রক্ষত্রিয়, কায়স্থ, ডোম, গোয়ালা, হাড়ি, কৈবর্ত্ত, কলু, মুচি ও তিলি জাতির সংখ্যা ২০০০০এর অধিক।

সমস্ত বাঙ্গলার উগ্রক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে শতকরা ৭৭·৫ জন বর্দ্ধমান জেলায় বাস করে। তদ্ভিন্ন বাগ্‌দি, বারুই, ভুঁইয়া, ডোম, গন্ধবণিক, কলু, কোরা, মুচি ও সাঁওতাল জাতির সংখ্যা বাঙ্গলার অন্যান্য জেলা অপেক্ষা বর্দ্ধমানে অধিক। কেবল মেদিনীপুরে ব্রাহ্মণ ও সদ্‌গোপ জাতির সংখ্যা বর্দ্ধমান অপেক্ষা অধিক।

নাম

অধুনা বিভাগ, জেলা ও প্রধান নগরের নাম বর্দ্ধমান। মুসলমানদিগের আমলে বর্দ্ধমান নামে নগর, মহাল, পরগণা ও চাকলা ছিল। হিন্দুদিগের সময়ে নগর ও ভুক্তি বর্দ্ধমান নামে অভিহিত হইত। রাজ্যের এক এক বৃহৎ ভাগকে ভুক্তি বলিত। সেকালের ৬টি ভুক্তির

নাম পাওয়া যায়—বর্দ্ধমান, দণ্ড, তীর, পুণ্ড্রবর্দ্ধন, জেজা ও শ্রীনগর। এক সময়ে সমস্ত মগধ ও বাঙ্গলা দেশ কোন রাজা বা সম্রাট্‌বিশেষের অধীনে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই।

প্রাকৃতিক বিবরণ

দামোদর, অজয় ও ভাগীরথী ভিন্ন বৃহৎ নদ নদী আর নাই। বরাকর, সিংহারণ, খড়ি, বাঁকা প্রভৃতি ক্ষুদ্র নদীও জেলার মধ্যে আছে। খড়ি ও বাঁকার উৎপত্তি স্থান দেখিয়া বোধ হয়, এগুলিও কাণানদীর ন্যায় এককালে দামোদরের শাখা ছিল। বল্লুকা ও গাঙ্গুড় নদীর শুষ্ক খাত বর্দ্ধমানের সন্নিকটে বর্ত্তমান আছে। ধর্ম্মমঙ্গলে প্রথমটির ও মনসামঙ্গলে দ্বিতীয়টির উল্লেখ আছে।

বর্দ্ধমানে পাহাড়-পর্ব্বত নাই, তবে পশ্চিমাংশে প্রস্তরময় ভূমি আছে, যাহা হইতে বর্দ্ধমানের "রাঙ্গামাটী" নাম। এই অংশে "লেটারাইট"-প্রস্তর ও তজ্জাত ভূমি আছে। নিম্নে কয়লার খনি। এখানকার ভূমিতে যথেষ্ট লৌহ আছে। সদর, কালনা ও কাঁটোয়া মহকুমার ভূমি পল্বলময় ও যথেষ্ট উর্ব্বরা।

উৎপন্ন দ্রব্য

ধান্য ও কয়লা বর্দ্ধমানের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। রাণীগঞ্জে কাগজ ও বার্ণ্ কোম্পানীর মৃন্ময় দ্রব্যের কারখানা আছে। জেলায় কয়েকটি তেলের ও চাউলের কল আছে। কাঞ্চন-নগরের ছুরী-কাঁচি, বনপাশের পিত্তলনির্ম্মিত দ্রব্য ও বামের দেশীধুতি বিখ্যাত। মিহিদানা ও সীতাভোগ নামক মিষ্টান্নের জন্য বর্দ্ধমান নগর প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

ভৌগোলিক পরিবর্ত্তন

রাঢ়প্রদেশে বর্দ্ধমান-ভুক্তির কতদূর বিস্তৃতি ছিল, জানিবার উপায় নাই। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে শরিফাবাদ সরকারে বর্দ্ধমান একটি মহাল বলিয়া উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। মুর্শিদকুলি খাঁ ১৭২২ খৃঃ অব্দে বাঙ্গলা দেশকে ২৩ চাকলায় বিভক্ত করেন। তন্মধ্যে বর্দ্ধমান এক চাকলা। ১৭৪০ খৃঃ অব্দে বর্দ্ধমানের রাজা চিত্রসেন রায় এই বর্দ্ধমান চাকলার রাজরূপে দিল্লীর বাদশাহের নিকট সনন্দ প্রাপ্ত হন। মীরকাশিম নবাব হইয়া ১৭৬০ খৃঃ অব্দে বর্দ্ধমান চাকলা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দান করেন। তখন বর্দ্ধমান ও বাকুড়া জেলার সমস্ত এবং বীরভূম ও হুগলী জেলার কিয়দংশ ইহার অন্তর্গত ছিল। ১৮২০ খৃঃ অব্দে বাঁকুড়া ও ১৮৩৩ খৃঃ অব্দে হুগলী জেলা পৃথক্ হইয়া যায়।

প্রাকৃতিক উৎপাত

১৮৫৫ খৃঃ অব্দে রেলওয়ে খুলিবার পরে বর্দ্ধমান স্বাস্থ্যনিবাস হয়। কিন্তু ১৮৬২-৭৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর অত্যাচারে বর্দ্ধমানের পল্লী ও নগর প্রায় জনশূন্য

হইয়াছিল। এখন ম্যালেরিয়ার প্রকোপ সেরূপ না থাকিলেও বাঙ্গলার কোন অংশ অপেক্ষা অত্যাচার এখানে কম নয়।

দামোদরের বন্যায় মধ্যে মধ্যে লোকের সর্ব্বনাশ হয়। ১৭৭০, ১৭৮৭, ১৮২৩, ১৮৫৫ ও ১৯১৩ খৃঃ অব্দে দামোদরের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলার বহু স্থান প্লাবিত হয়। ইহাতে বহু সম্পত্তি নষ্ট হয় এবং বহু লোক ও গবাদি পশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

পরগণা

বর্ত্তমানে বর্দ্ধমান জেলায় বহু পরগণা আছে। ইহার মধ্যে কতকগুলি নাম মুসলমান-যুগে প্রদত্ত; যথা,—শাহাবাদ, হাভেলি, মজঃফরশাহী, আমিরাবাদ, আজমতশাহী, জাহাঙ্গীরাবাদ, শেরগড়, শিলামপুর প্রভৃতি। আর কতকগুলি হিন্দু-যুগের নাম; যথা,—বর্দ্ধমান, সাতশইকা, খণ্ডঘোষ, গোপভূম, সেনভূম, শিখরভূম, সেনপাহাড়ী, চম্পানগর, ইন্দ্রাণী ইত্যাদি।

প্রবাদ

এই চম্পানগরে চাঁদসদাগরের বাটী ছিল। গাঙ্গুড় বা বেহুলা নদী দিয়া বেহুলা লখিন্দরের শবদেহ কলার মান্দাসে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। গোপভূম এককালে সদ্‌গোপদিগের রাজ্য ছিল। বর্দ্ধমান জেলার মানকরের সন্নিকটে গোপরাজ মহেন্দ্রনাথের গড় ছিল। ইহা উমরার গড় নামে প্রসিদ্ধ। সেনপাহাড়ীতে লাউসেনের প্রতিদ্বন্দ্বী ইছাইঘোষের রাজধানী ছিল। সেনভূম সম্ভবতঃ লাউসেনের পিতা কর্ণসেনের বা তদীয় বংশধরগণের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

গড়

বর্দ্ধমান জেলায় বহু প্রাচীন গড়ের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার কতকগুলি হিন্দু-যুগের আর কতকগুলি দুর্গ মুসলমানেরা নূতন নির্ম্মাণ করে অথবা হিন্দু-নির্ম্মিত গড়গুলিই নিজেরা ব্যবহার করিত। কয়েকটি গড়ের নাম নিম্নে লিখিত হইল,—

১, তালিতগড় বা মহবৎগড়—বর্দ্ধমানের এক ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। ইহারই নিকটে নবাবের হাটে ১০৮ শিবমন্দির অবস্থিত। ২, খাজাহানগার গড়—বর্দ্ধমানের দক্ষিণস্থ উচালনের নিকট। ৩, শক্তিগড়—ই, আই, কোম্পানীর ষ্টেশন। ৪, রামচন্দ্রগড়—ডাটাকুলের নিকট। ৫, মরপালগড়—কামারকিতার নিকট। ৬, উমরারগড়—মানকরের নিকট। ৭, শেরগড়—রাণীগঞ্জের নিকট। ৮, সমুদ্রগড়। ৯, পানাগড়। ১০, রাজগড় ও আরও দুই একটি গড়ের চিহ্ন কাঁকসার নিকটে আছে। ১১, কুলীনগ্রামের গড়। ১২, মঙ্গলকোট। ১৩, গড় সোণাডাঙ্গা। ১৪ ও ১৫, দিঘা ও চুরুলিয়ার গড়। ১৬, কালনার গড়।

সম্ভ্রান্তবংশ

(১) বর্দ্ধমান-রাজবংশ, (২) শিয়ারশোল-রাজবংশ, (৩) চকদীঘির সিংহরায়, (৪) বৈদ্য-পুরের নন্দী, (৫) দেবীপুরের সিংহ, (৬) শ্রীবাটীর চন্দ্র, (৭) কাইগ্রামের মুন্সী, (৮) বর্দ্ধমানের তেওয়ারি এবং (৯) কুসুমগ্রাম, বোহার প্রভৃতি স্থানের মিঞাবংশ জেলার মধ্যে সম্ভ্রান্ত বলিয়া খ্যাত।

বর্দ্ধমান-রাজবংশ

বর্দ্ধমান-রাজবংশের স্থাপয়িতা সঙ্গমসিংহ প্রথমে বর্দ্ধমান হইতে ২॥০ ক্রোশ দূরে বৈকুণ্ঠপুরে বাস করিতেন। বল্লুকানদী তীরস্থ বৈকুণ্ঠপুর তথন বাণিজ্যের স্থান ছিল। এখনও এই রাজবংশের গড়খাই করা বৃহৎ বাটীর ভগ্নাবশেষ বৈকুণ্ঠপুরের প্রান্তে দেখিতে পাওয়া যায়। সঙ্গমরায়ের পুত্র বঙ্কুবিহারী রায়। তৎপুত্র আবুরায় ১৬৫৭ খৃঃ অব্দে বর্দ্ধমান চাকলার ফৌজদারের অধীনে বর্দ্ধমান নগরের অন্তর্গত পেকাবে বাগান বা রেখাবে বাজারের কোতোয়াল ও চৌধুরী নিযুক্ত হন। তৎপুত্র বাবুরায় বর্দ্ধমান পরগণা ও অন্য তিনটি মহালের অধিকারী হইয়াছিলেন। তৎপুত্র ঘনশ্যাম রায় ও তৎপুত্র কৃষ্ণরাম রায়। ইনি কয়েকটি নূতন মহাল হস্তগত করিয়া বাদশাহ আওরঙ্গজেবের নিকট প্রথম সনন্দ প্রাপ্ত হন (১৬৮৯ খৃঃ অব্দ)। ইঁহারই সময়ে ১৬৯৭ খৃঃ অব্দে চিতুয়া বরদার জমীদার শোভাসিংহ পাঠান-সর্দ্দার রহিমখাঁর সহিত মিলিত হইয়া বিদ্রোহী হইয়া ইঁহাকে যুদ্ধে নিহত করেন। তৎপুত্র জগৎরাম রায় দিল্লীর বাদশাহের নিকট ২য় সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া ১৭০২ খৃঃ অব্দে শত্রুকর্ত্তৃক কৃষ্ণশায়র পুষ্করিণীতে নিহত হন। ইঁহারই পুত্র বিখ্যাত যোদ্ধা কীর্ত্তিচন্দ্র। তিনি চন্দ্রকোণা, বর্দ্দী, বালিগড়ি ও বিষ্ণুপুরের রাজাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাঁহাদিগের রাজ্য হস্তগত করেন। পরে বিষ্ণুপুরের রাজার সহিত সন্ধি করিয়া নবাব আলিবর্দ্দীর পক্ষে মার্হাট্টাদিগের সহিত যুদ্ধ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ১৭৪০ খৃঃ অব্দে তৎপুত্র চিত্রসেন রায় বাদশাহের ৩য় সনন্দে প্রথম রাজোপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি নিঃসন্তান হইয়া পরলোক গমন করিলে, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ১৭৪৪ খৃঃ অব্দে রাজ্যলাভ করেন। ১৭৫৩ খৃঃ অব্দে তিনি দিল্লীর বাদশাহ মহম্মদশাহের নিকট ৪র্থ সনন্দ প্রাপ্ত হন ও কিয়দ্দিন পরে মহারাজাধিরাজ উপাধি প্রাপ্ত হন। ইঁহার আমলে বর্দ্ধমান চাকলা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে প্রদত্ত হইলে ইনি বীরভূমের রাজার সহিত বিদ্রোহী হন। দুইবার ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর সৈন্যদলকে পরাজিত করিয়া তৃতীয় বার স্বয়ং পরাজিত হন। তৎপরে ১৭৬০ ও ১৭৬১ খৃঃ অব্দে তিনি কোম্পানীকে স্বয়ং রাজস্ব প্রদান করেন। ১৭৬২ হইতে ১৭৭৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত কোম্পানী বর্দ্ধমান জমিদারী খাস দখলে রাখিয়া বর্দ্ধমান রাজকে মালিকানা প্রদান করিতেন। ১৭৭০ খৃঃ অব্দে মহারাজ তিলকচন্দ্রের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র তেজচন্দ্র রাজ্য প্রাপ্ত হন। ১৭৭১-১৮৩২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত মহারাজ তেজচন্দ্র রাজত্ব করেন। বর্দ্ধমান জমীদারীর রাজস্ব আদায়ের জন্য মহারাজ নবকৃষ্ণ সাঁজোয়াল হইয়া ১৭৮০-১৭৮২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বর্দ্ধমানে ছিলেন। মহারাজ তেজচন্দ্রের সময়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছিল।

বর্দ্ধমানরাজ-কর্ত্তৃক পত্তনী-প্রথার প্রচলন হইলে ১৮২৯ খৃঃ অব্দে পত্তনী-আইন বিধিবদ্ধ হয়। মহারাজ তেজচন্দ্রের পুত্র প্রতাপচন্দ্রের মৃত্যু হইলে মহাতাপচাঁদ পোষ্যপুত্ররূপে গৃহীত হন। মহারাজ মহাতাপচাঁদ ১৮৩২-১৮৮১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইনি মহাভারত ও হরিবংশ বাঙ্গলায় অনুবাদ করিয়া বিতরণ করেন। তিনি নামের পূর্ব্বে হিস্ হাইনেস্ (His Highness) লিখিবার অধিকার পাইয়াছিলেন ও ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও কবি

বিশ্বকোষ সঙ্কলয়িতা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ঠিক করিয়াছেন, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের ৫৬ গাঁইএর মধ্যে ২৪টি গ্রাম বর্দ্ধমান জেলার মধ্যে আছে।

শ্রীগৌরাঙ্গদেব বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়ায় সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। বর্দ্ধমান জেলায় শ্রীখণ্ড, কুলীন গ্রাম প্রভৃতি স্থানে বহু বৈষ্ণব জন্মগ্রহণ করিয়া বর্দ্ধমান জেলাকে পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। কড়চা-প্রণেতা গোবিন্দদাস বর্দ্ধমানের কাঞ্চননগর পল্লীতে জন্ম গ্রহণ করেন। চৈতন্যচরিতামৃত-রচয়িতা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ ঝামটপুরে, চৈতন্যমঙ্গল-প্রণেতা জয়ানন্দ আমাইপুরে ও চৈতন্যমঙ্গল-প্রণেতা লোচনদাস কোগ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

অভয়ামঙ্গল বা চণ্ডী-প্রণেতা কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী ও কাশীরামদাস বর্দ্ধমানের দামুন্যা ও সিঙ্গি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ধর্ম্মমঙ্গল-প্রণেতা ঘনরাম চক্রবর্ত্তী খণ্ডঘোষ থানার অধীন কৃষ্ণপুরে জন্ম গ্রহণ করেন ও মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন। মহারাজ তেজচন্দ্রের গুরু সাধক কমলাকান্ত অম্বিকায় জন্ম গ্রহণ করিয়া চান্নায় বাল্যকাল অতিবাহিত করেন ও শেষ বয়সে বর্দ্ধমান নগরে বাস করিয়াছিলেন। রামরসায়ন প্রণেতা রঘুনন্দন গোস্বামী মানকরের সন্নিকটে সাড়াগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

পণ্ডিত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ ও বিখ্যাত যাত্রাওয়ালা নীলকণ্ঠ বর্দ্ধমান জেলার লোক ছিলেন। অক্ষয়কুমার দত্ত, দাশরথি রায়, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ রায়, মতিলাল রায়, চিরঞ্জীব শর্ম্মা ও যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর জন্মস্থানও বর্দ্ধমান জেলায়।

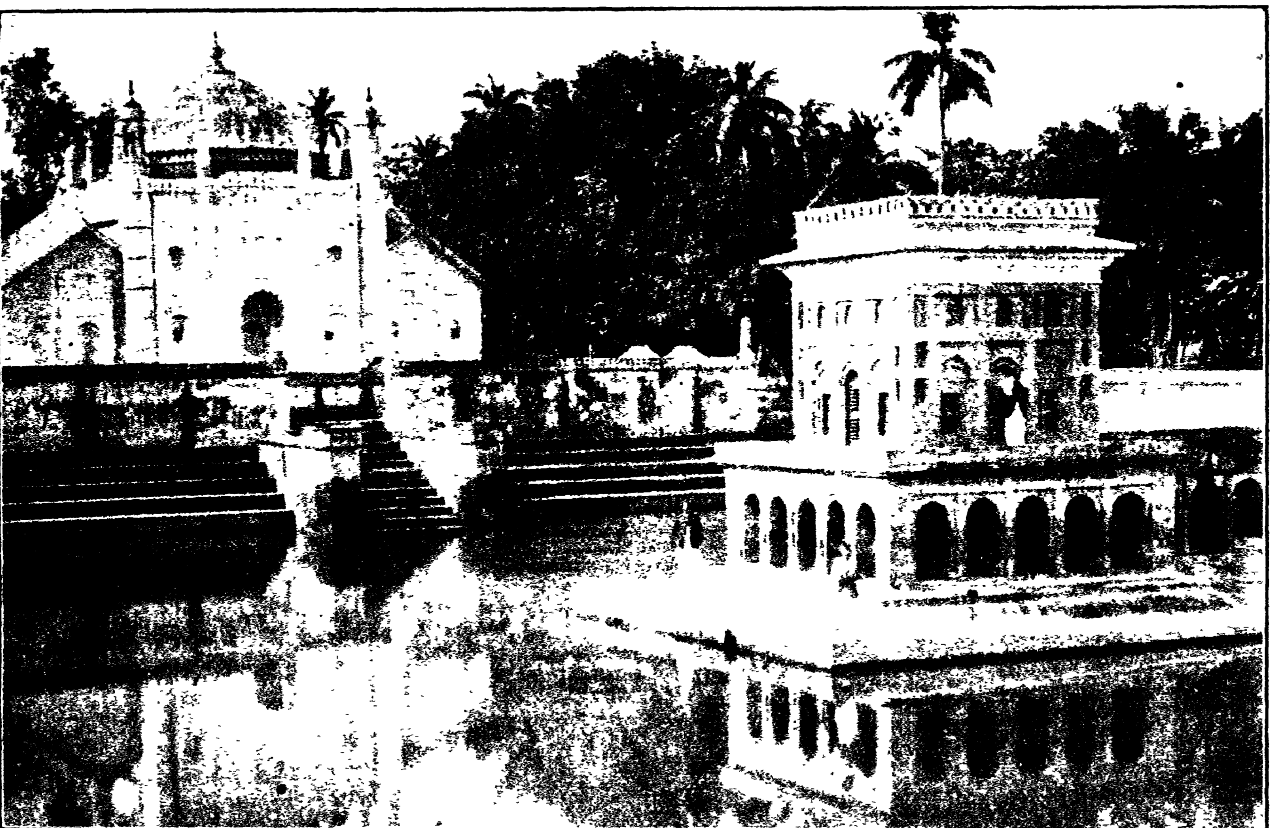
বিখ্যাত গায়ক দেওয়ান মহাশয় ও "সখি! শ্যাম না আইল" গানের রচয়িতা রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় বর্দ্ধমান রাজ-সংসারে চাকরী করিতেন।

বর্দ্ধমান নগরের কথা

শায়র বা পুষ্করিণী

নগরে প্রবেশ করিতেই যে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী দৃষ্ট হয়, তাহা রাণীশায়র, মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের জননী রাণী ব্রজসুন্দরী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। দক্ষিণ ঘাটে শিলালিপি আছে। ইহার পশ্চিমে শামশায়র, ঘনশ্যাম রায় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ইহার পশ্চিমে কৃষ্ণশায়র, কৃষ্ণরাম রায় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

কাঞ্চননগর পল্লীই পুরাতন বর্দ্ধমানের বাণিজ্যের স্থান ছিল। এই কাঞ্চননগরের ছুরী-কাঁচি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এখানে রথযাত্রার সময়ে মেলা হয়। মহারাজাদিগের



পীর বহরামের কবর ও জলমধ্যস্থিত ঘর

[১৭ পৃষ্ঠা

PHOTO BY S. K NAG

দুইটি কাষ্ঠের বৃহৎ রথ আছে। ইহার দক্ষিণ-পশ্চিমে রাস্তার উপর বারদ্বারী নামে একটি ফটক আছে। প্রবাদ এইরূপ যে, মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র বিষ্ণুপুর-রাজকে পরাজিত করিয়া কীর্ত্তি-চিহ্ন স্বরূপ এই ফটক প্রস্তুত করিতে আদেশ দেন। ইহার দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশে ইদিলপুর। বর্দ্ধমান খাসে থাকিবার সময় এখানে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছারী ছিল।

পল্লী

কাঞ্চননগরের উত্তরে বাঁকা নদীর পরপারে রাজগঞ্জের মহন্ত-মহারাজের "অস্থল"। এই সন্ন্যাসিগণ নিম্বার্ক সম্প্রদায়ভুক্ত। বর্ত্তমান মহন্ত-মহারাজ আনুমানিক দুই লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

ইহার উত্তর-পশ্চিমে লাকুর্ডি। এখানে জলের কল আছে, ১৮৮৪ ৮৫ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত হয়। নিকটেই বর্দ্ধমানের উত্তর-মশান-স্থিত তুল্যভাকালীর মন্দির। দামোদরের তীরে ও ইদিলপুরের পূর্ব্বে দক্ষিণ-মশান-স্থিত তেজগঞ্জের কালীর মন্দির। ইহাতেই অনুমান হয়, পুরাতন বর্দ্ধমান ইহারই মধ্যে অবস্থিত ছিল।

লাকুর্ডির পূর্ব্বে টিকরহাট ও কোটালহাট। টিকরহাটের দামোদরকুণ্ড নামক পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারের সময় বহু দেবমূর্ত্তি ও স্তম্ভ পাওয়া গিয়াছিল। কোটালহাটে সাধক কমলাকান্ত বাস করিতেন।

টিকরহাটের পশ্চিমোত্তরে কাজীর বেড় ও কাজীর হাট। তাহার পশ্চিমে মুসলমান-প্রধান গোদাপল্লী। প্রবাদ এইরূপ, পাঠানগণ প্রথমে গোদার রাজাকে পরাজিত করিয়া বর্দ্ধমান অধিকার করে। প্রথমে মুসলমানগণ পরাজিত হয়, পরে কৌশলে 'জীওতকুণ্ড' নষ্ট করিয়া জয় লাভ করে। যে স্থানে প্রথমে মুসলমান নিহত হইয়াছিল, তাহা সহিদতলা নামে বিখ্যাত। সেখানে একটি পুরাতন মস্‌জিদ আছে। নিকটে গোদা-রাজার মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান। গোদার উত্তর-পূর্ব্বে প্রান্তর মধ্যে মহারাজের দিলকুশা বা গোপালবাগ অবস্থিত।

রাজবাড়ীর উত্তর-পূর্ব্বাংশে বোরহাটে মহারাজাদিগের পুরাতন জেলখানা ছিল। অপরাধীর কারাবাসের ব্যবস্থা ১৭৯০ খৃঃ অব্দে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী স্বয়ং গ্রহণ করেন ও এই স্থানেই বহু দিন কোম্পানীর কাছারী ছিল। ইহারই সন্নিকটে মহারাজ নবকৃষ্ণ দুই বৎসর বাস করিয়াছিলেন। তেওয়ারীদিগের বসত বাটী ইহারই সন্নিকটে।

রাজবাড়ীর দক্ষিণ-পশ্চিমে রাজ-কলেজ। ইহা প্রথমে বাঙ্গলা ও ইংরাজী বিদ্যালয়রূপে ১৮১৭ খৃঃ অব্দে স্থাপিত হয়। ১৮৮১ খৃঃ অব্দে ইহা ২য় শ্রেণীর কলেজে পরিণত হয়। সন্নিকটে রাধাবল্লভ, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি ৩টি দেবায়তন আছে।

রাজ-কলেজের পূর্ব্বে পুরাতন চক। ইহার উত্তরাংশে আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিমুখানের চারি বৎসর বর্দ্ধমানে অবস্থিতির সময় তৎকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত জুমা-মস্‌জিদ আছে। পুরাতন চকের দক্ষিণে পীর বহরাম, শের আফ্‌গান ও কুতুব উদ্দীনের সমাধি আছে। বহরাম সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া গুরুর আদেশে

পীর বহরাম

মক্কায় পিপাসিত তীর্থযাত্রীদিগকে সুশীতল বারি পান করাইতেন, তজ্জন্য শক্কা উপাধি পান। তিনি বাদশাহ আকবরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া চট্টগ্রাম প্রদেশে তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্যে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে বৰ্দ্ধমানে কিছুদিন অবস্থান করেন। যোগী জয়পালকে অলৌকিক কার্য্য দেখাইয়া তাঁহার আশ্রম প্রাপ্ত হন। তাঁহার রচিত কবিতার অনুলিপি বর্ত্তমান মাতোয়ালির নিকটে আছে। ১৫৭৪ খৃঃ অব্দে তাঁহার লোকান্তর হয়। বাদশাহ জাহাঙ্গীর শের আফগানকে মারিবার জন্য নিজের দুধ-ভাই কুতুব উদ্দীনকে বাঙ্গলার সুবাদার করিয়া প্রেরণ করেন। রাজমহলে শের আফগানকে মারিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইবার পরে শের বৰ্দ্ধমানে আসিয়া বাস করেন। এখানেও কুতুব উদ্দীন আগমন করিলে শের সুবাদারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে কুতুবের সঙ্গিগণ তাঁহাকে অপমান করেন। শের কুতুবের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া কুতুবকে হত্যা করিলে কুতুবের অনুচরগণ শের আফগানকে একযোগে আক্রমণ করিয়া নিহত করেন (১৬০৬ খৃঃ অব্দে)। কাহারও মতে এই ঘটনা স্বাধীনপুরে (সাধনপুর) সংঘটিত হয়। সাধনপুর পল্লী বৰ্দ্ধমান ষ্টেশনের উত্তরে।

এই পুরাতন চকের দক্ষিণাংশে একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত স্তূপের খিলানের উপরি ভাগকে লোকে সুন্দরের সুড়ঙ্গ বলিয়া দেখায়। বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান যে সম্পূর্ণ কাল্পনিক, তাহা বোধ করি এখন সকলেই স্বীকার করিবেন।

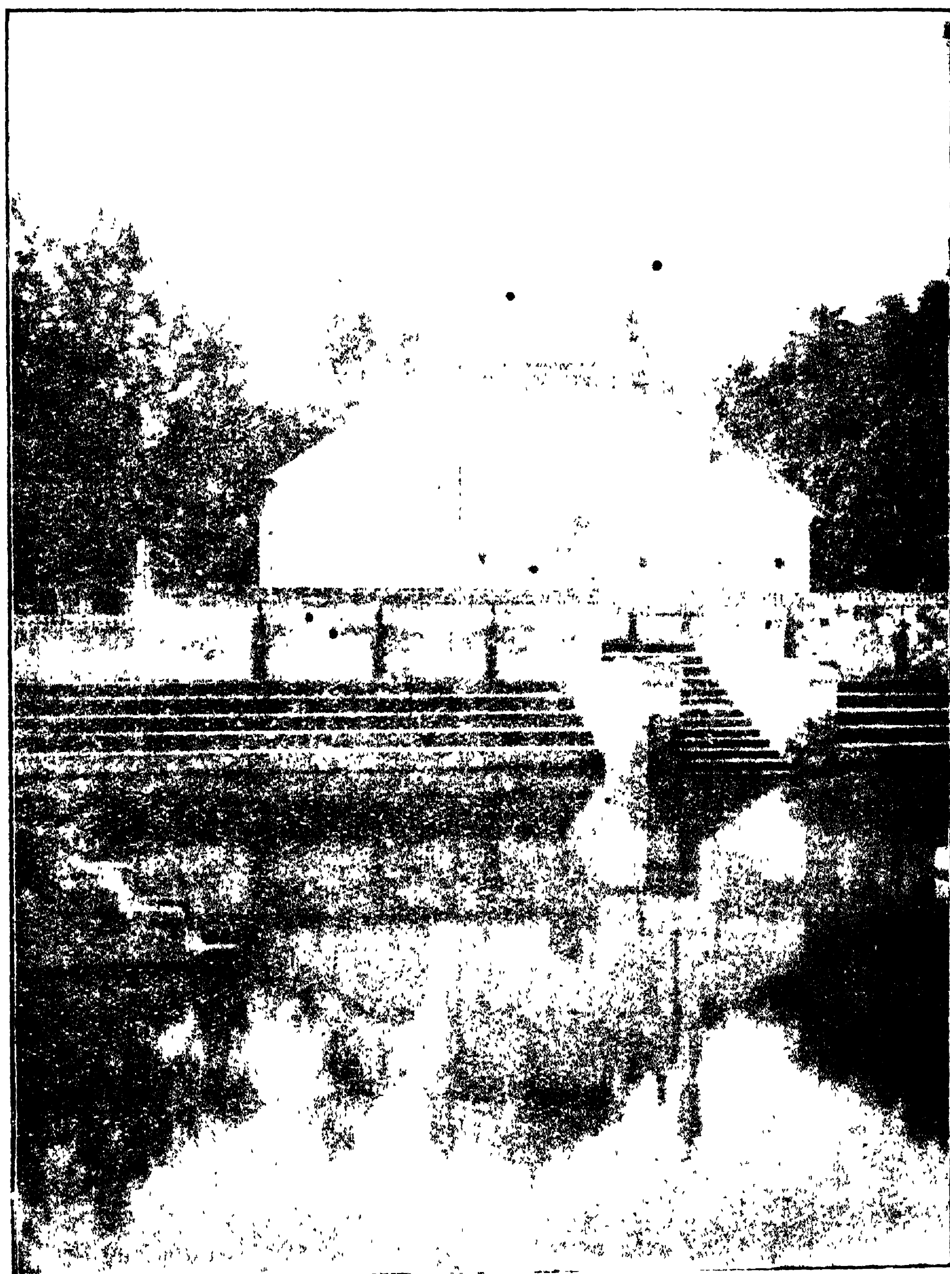
রাজবাড়ীর পুর্ব্বাংশ আঞ্জুমান বা কাছারী, মধ্যাংশ অন্তঃপুর ও পশ্চিমাংশ প্রাসাদ। এই পশ্চিমাংশের দক্ষিণ-ভাগে খক্কর সা নামক ফকীরের সমাধি আছে। এই অংশের পূর্ব্বে বরহান বাজার ছিল।

রাজবাড়ীর পুর্ব্বে শ্যামবাজারে হাস্যরসের অবতার স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথের বাসবাটী আছে। ইহারই নিকটে জনৈক রাজপুরোহিত কর্ত্তৃক ১১৬৮ সালে স্থাপিত বহু শিব মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে।

শ্যামবাজারের পুর্ব্বে বৰ্দ্ধমানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সর্ব্বমঙ্গলার সুবৃহৎ মন্দির অবস্থিত।

রাজবাড়ীর ঠিক পূর্ব্বে বড়বাজার ও তৎপূর্ব্বে রাণীগঞ্জ বাজার। বড়বাজার রাস্তার পার্শ্বে চার্চ্চ মিশনারি সোসাইটীর প্রথম মিশনারি ওয়েটব্রেট সাহেবের স্মৃতিচিহ্ন রূপে একটি হল ও মহারাজ আফ্‌তাবচাঁদ কর্ত্তৃক স্থাপিত "বৰ্দ্ধমান রাজ ফ্রি পাব্‌লিক লাইব্রেরী" অবস্থিত। ইহারই পুর্ব্বে "ষ্টার অব ইণ্ডিয়া" গেট। লর্ড কার্জ্জনের বৰ্দ্ধমানে আগমনের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ ইহা বর্ত্তমান বৰ্দ্ধমানাধিপতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে।

ইহার পুর্ব্বদিকে ১৮২০ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত গৃহ। দক্ষিণে মহারাজাধিরাজ আফ্‌তাবচাঁদের জনক-বংশ গোপালবাবুর সম্পূর্ণ ব্যয়ে নির্ম্মিত সুবৃহৎ টাউন-হল। টাউনহলের দক্ষিণে বীরহাটা নামক পল্লী। ভারতচন্দ্রের "আট হাট ষোল গলি বত্রিশ বাজার"এর মধ্যে ৫টি হাট বর্ত্তমান বৰ্দ্ধমানের পশ্চিম অংশে অবস্থিত। রাজবাড়ীর পুর্ব্বাংশ সমস্তই মুরাদপুর নামে পরিচিত ছিল। বাঁকানদীর উত্তরে বর্ত্তমান বৰ্দ্ধমানের অধিকাংশ



খাজা আনোয়ারের কবর

[১৯ পৃষ্ঠা

'PHOTO BY S K NAG

অবস্থিত। তেজগঞ্জের উত্তর-পূর্ব্বে ও বাঁকার দক্ষিণ তীরে খাজানর বেড়, জগৎ বেড় ও মিঞার বেড় অবস্থিত। বেড় সম্ভবতঃ গড়খাইকরা স্থানের নাম। ১৭৪০-১৭৬১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত মার্হাট্টাগণ বর্দ্ধমানে অত্যন্ত উপদ্রব করে। সেই সময়ে এই বেড়গুলি নির্ম্মিত হয়।

খাল ও নদী

বর্ত্তমান বর্দ্ধমানের মধ্যে কেবল কাঞ্চননগর, ইদিলপুর, তেজগঞ্জ ও সদরঘাট পল্লী দামোদরের সন্নিকটে অবস্থিত। ১৮৫২ খৃঃ অব্দে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক দামোদরের বাঁধ প্রস্তুত হইলে দামোদরের শাখা কাণা নদীর মুখ বন্ধ হওয়ায় কাণা নদীর তীরে অবস্থিত গ্রামে জলকষ্ট উপস্থিত হয়। তন্নিবারণকল্পে ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে একটি সাময়িক খাল কাটা হয়। ১৮৮১ খৃঃ অব্দে বর্ত্তমান ইডেন খাল কাটা হয়। ইহা জুজুতি হইতে নির্গত হইয়া জলের কলের নিকট বাঁকার মিলিত হইয়াছে, তৎপরে দামোদরের বাঁধের উত্তর পার্শ্ব দিয়া দক্ষিণাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে।

বাঁকা নদীর উপর ৩টি পুল আছে। প্রথম রাধাগঞ্জের পুল। ইহা ১৮২১ খৃঃ অব্দে মহারাজ তেজচন্দ্র কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। ২য় পুল সর্ব্বমঙ্গলার ঘাটের নিকট, মিউনিসিপালিটি কর্ত্তৃক অল্পদিন হইল নির্ম্মিত হইয়াছে। ৩য় বীরহাটার পুল। ইহা ১৮০২ খৃঃ অব্দে কোম্পানী কর্ত্তৃক বর্ত্তমান গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্করোডের উপর ২০০০০৲ ব্যয়ে নির্ম্মিত হয়।

বাঁকার দক্ষিণ-তীরস্থ পল্লী

খাজানর বেড় খাজা আনোয়ার শব্দের অপভ্রংশ। খাজা আনোয়ার আজিমুশ্বানের মন্ত্রী ও সেনাপতি ছিলেন। রহিম খাঁ চাতুরী করিয়া সন্ধির অছিলায় খাজা আনোয়ারকে ৫ জন অনুচরসহ সাক্ষাৎ করিতে বলিলে, খাজা আনোয়ার যেমন রহিম খাঁর নিকটে আগমন করিলেন, অমনই অসতর্কভাবে বহু সৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া নিহত হইলেন। আজিমুশ্বানের পুত্র ফরোখশিয়ার বাদশাহ হইয়া খাজা আনোয়ারের সমাধির জন্য দুই লক্ষ মুদ্রা ও কয়েকখানি গ্রাম ব্যয় স্বরূপ প্রদান করেন। তাহাতেই খাজা আনোয়ারের ও তাঁহার ৪ জন অনুচরের সমাধি সমন্বিত বেড়ের নবাববাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে। এই বাটীর সমস্ত গৃহগুলি খিলানে নির্ম্মিত। ক্ষুদ্র ইষ্টক নির্ম্মিত জালায়নগুলি দ্রষ্টব্য। গম্বুজ ব্যতীত এখানে হস্তিপৃষ্ঠের ন্যায় ২টি খিলান আছে। বৃহৎ গজগিরি পুষ্করিণীতে ১টি জলটুঙ্গি আছে।

খাজা আনোয়ার

খাজানর বেড়ের সন্নিকটে রসুপুর, গোলাহাট ও ভাতশালা নামক তিনটি মুসলমান-প্রধান পল্লী। খাজানর বেড়ের পূর্ব্বে জগৎ বেড় ও তাহার পূর্ব্বে নীলপুর। এই নীলপুরের সন্নিকটে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্করোডের পার্শ্বে কানাই নাটশালের দুইটি কুঠী আছে। যেটি মিউনিসিপ্যাল সীমানার বাহিরে, সেটি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠী ছিল। নিকটেই বাম নামক পল্লীতে কোম্পানীর আমলে বহু তন্তুবায় বাস করিত। এখনও বামে সুন্দর দেশী ধুতি প্রস্তুত হয়। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে বা তাহার পূর্ব্বে কোম্পানী ব্যবসা বন্ধ করিলে সুকলের কুঠীর ম্যানেজার টীপ

সাহেবের স্থাপিত ডেভিড্ আর্স্কিন কোম্পানী এই কুঠী ক্রয় করিয়া নীলকুঠীতে পরিবর্ত্তিত করে। ১৮৭৯ খৃঃ অব্দে ইহাদের ব্যবসা ফেল হইলে, এই কুঠী বিক্রীত হয়। ইহার বর্ত্তমান অধিকারী চকদীঘির সুপ্রসিদ্ধ জমীদার রায় শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সিংহরায় বাহাদুর।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জনৈক কর্ম্মচারী কাপ্তেন ষ্টুয়ার্ট ১৮১৬ খৃঃ অব্দে চার্চ্চ মিশন সোসাইটী স্থাপন করেন। এই মিশন কর্ত্তৃক এই সময়ে ২টি বাঙ্গলা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বিদ্যালয়ের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া পরে ১০টি পর্য্যন্ত হয়, ইহাতে ছাত্রসংখ্যা ১০০০ পর্য্যন্ত হইয়াছিল। ১৮১৯ খৃঃ অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠীর পশ্চিম পার্শ্বে এই মিশনের একটি আড্ডা ছিল। ১৮৭২ খৃঃ অব্দে ম্যালেরিয়ার অত্যাচারে ছাত্র-সংখ্যা কমিয়া যাওয়ায় বিদ্যালয়গুলি উঠিয়া যায়।

অন্যান্য বিবরণ

বর্দ্ধমান নগরের দৈর্ঘ্য ৩·৮ মাইল ও বিস্তার ২·৩ মাইল; আয়তন ৮·৭১৬ বর্গ-মাইল; লোক সংখ্যা ৩৫৯২১, তন্মধ্যে হিন্দু ২৬৫৩১ ও মুসলমান ৯১৫৮।

বর্দ্ধমান নগর বিষুবরেখার ২৩° ১৪′ ১০″ উত্তরে অবস্থিত। বর্দ্ধমান নগরের কিঞ্চিৎ উত্তর দিয়া জেলার মধ্যে মকরক্রান্তি গিয়াছে। গ্রীনিচের অক্ষরেখা হইতে পূর্ব্বদিকে ৮৭° ৫৩′ ৫৫″ দূরে অবস্থিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১০৪ ফুট উচ্চ।

বর্ত্তমান গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্করোড নগরের মধ্য দিয়া গিয়াছে। তদ্ভিন্ন কালনা, কাঁটোয়া, বাঁকুড়া ও জাহানাবাদ যাইবার বড় রাস্তা বর্দ্ধমান হইতে বাহির হইয়াছে। কাঁটোয়ার রাস্তার সহিত গৌড় হইতে বাদশাহী রাস্তা মিলিত হইয়া বর্দ্ধমান নগরের মধ্য দিয়া জাহানাবাদ অঞ্চলে গিয়াছে।

মুসলমান-যুগের ঐতিহাসিক সম্বন্ধ

পাঠানেরা বঙ্গ-বিজয়ের প্রথম অবস্থায় বর্দ্ধমান জেলা অধিকার করে। তজ্জন্য ইহার অধিকাংশ শরিফাবাদ সরকারের অন্তর্গত বলিয়া আইন্-ই-আকবরীতে উল্লিখিত হইয়াছে। ১৫৭৪ খৃঃ অব্দে বঙ্গের শেষ স্বাধীন রাজা দাউদ খাঁর পরিবারবর্গ বর্দ্ধমান নগরে ধৃত হয়। বর্দ্ধমান শের আফ্গানের জায়গীর ছিল। সাহাজাদা খুরম বিদ্রোহী হইয়া বর্দ্ধমান অধিকার করিয়াছিলেন। শোভাসিংহের বিদ্রোহের পর অরঙ্গজেবের আদেশে সাহাজাদা আজিমুশ্বান বিদ্রোহ দমন ও পরে শান্তি স্থাপনের জন্য বর্দ্ধমানে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় ৪ বৎসর বাস করেন। সুফী বায়াজিদ নামক ফকীর বর্দ্ধমানে বাস করিতেছেন শুনিয়া তাঁহাকে আনিবার জন্য তিনি স্বীয় পুত্র ফরোখশিয়ার ও করিম উদ্দীনকে প্রেরণ করেন। ফরোখশিয়ার স্বীয় অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া ফকীরের পাদ বন্দনা করিলে ফকীর আশীর্ব্বাদ করিলেন, "তুমি দিল্লীর সিংহাসন লাভ করিবে।" আজিমুশ্বান বাদশাহী লাভের আকাজ্ক্ষা নাই জানাইলে, ফকীর স্বীয় আশীর্ব্বাদ বাক্য প্রত্যাহার করিতে পারিবেন না বলিয়া অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিলেন।

ফকীরের ভবিষ্যদ্বাণী যে সফল হইয়া ছিল, তাহা ইতিহাসের পাঠক জানেন। ফরোখশিয়ারের ব্যয়ে নির্ম্মিত মস্‌জিদ ও ফকীরের সমাধি কালনা রোডের পার্শ্বে খাঁপুকুরের সন্নিকটে অবস্থিত।

বর্দ্ধমান নগরের ১ ক্রোশ পশ্চিমে নবাবের হাট নামক স্থানে মহারাজ তেজচন্দ্রের জননী মহারাণী বিষ্ণুকুমারী কর্ত্তৃক কয়েকটি মন্দির ১৭৮৮ খৃঃ অব্দে স্থাপিত হয়। মন্দিরগুলি আয়ত-ক্ষেত্রাকারে অবস্থিত।

কালনার ১০৮ শিব মন্দির বৃত্তাকারে দুই পংক্তিতে অবস্থিত। কালনায় কীর্ত্তিচন্দ্রের পরবর্ত্তী কয়েকজন মহারাজের "সমাজ" আছে। দাঁইহাটে কীর্ত্তিচন্দ্রের ও পূর্ব্ববর্ত্তী মহারাজ-দিগের "সমাজ" আছে।

শ্রীরাখালরাজ রায়।



উজানি ও মঙ্গলকোট

উজানি নগর

উত্তর-রাঢ়ভূমি পরিদর্শনপূর্ব্বক লুপ্ত ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কার ও প্রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধান করিবার জন্য আমরা মঙ্গলকোট ও উজানি-ভ্রমণে গমন করিয়াছিলাম। উজানি ও মঙ্গলকোট প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থান। ধনপতি দত্ত ও শ্রীমন্ত দত্ত এবং খুল্লনা সম্বন্ধে কবিকঙ্কণ-চণ্ডীকাব্যে সবিশেষ উল্লেখ আছে, তাঁহাদের বাসভবন উজানি নগরে ছিল। উজানি বা মঙ্গলকোটে বিক্রমকেশরী নামক এক রাজা ছিলেন।

উজানি একটি পীঠস্থান। তথায় দেবী ভগবতীর কনুই পতিত হইয়াছিল। দেবী মঙ্গলচণ্ডী এবং ভৈরব কপিলাম্বরের অবস্থান জন্য উজানি বা মঙ্গলকোট হিন্দুমাত্রেরই তীর্থস্থান। এই উজানিতে লোচনদাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব কবিগণ তাঁহাকে বড়াইবুড়ীর অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন। লোচনদাস চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়া মহকুমার অধীন মঙ্গলকোট থানার অন্তর্গত পরগণা আজমৎসাহীর মধ্যে উজানি নগর অবস্থিত। 'উজানি নগর' বলিলে এখন আর সাধারণে বুঝিতে পারিবেন না। উজানির সে গৌরবস্মৃতি মুছিয়া গিয়াছে। উজানির সম্পদ্, বাণিজ্য ও জনবহুলতা এক্ষণে কল্পনার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। যখন গৌড় বঙ্গের রাজধানী ছিল, তখন উজানির গৌরব ছিল। গৌড়ের ধ্বংস হইয়াছে, উজানিও সেই সঙ্গে মহিমাচ্যুত হইয়াছে। যখন ধনী বণিক্‌গণের বাণিজ্যপোতগুলি ভ্রমরার ঘাটে বাঁধা থাকিত, তখন এই স্থানের নাম ছিল উজানি; মুসলমান বাদশাহী দপ্তরে উজানির নাম হয় 'সুগ্রাম'। চৈতন্য-মঙ্গল-প্রণেতা লোচনদাস (ত্রিলোচনদাস) তাঁহার জন্মভূমির নাম 'কোগ্রাম' বলিয়াছেন। তাঁহার ভার্য্যা পতিসহবাসে বঞ্চিতা হইয়া এই গ্রামের নাম 'কুগ্রাম' রাখিয়াছিলেন। গ্রামবাসীরা সতীর সম্মান রক্ষার জন্য 'কুগ্রাম' এবং লোচনদাসের সম্মানের জন্য 'কোগ্রাম', এই উভয় নামই ব্যবহার করিয়া থাকেন। বাদশাহী 'সুগ্রাম' নামের ব্যবহার আর নাই।

মঙ্গলকোটের পুলিশ-ষ্টেসন হইতে উত্তর-পূর্ব্বাংশে উজানি অবস্থিত। এই উন্নত স্থানে দাঁড়াইয়া উজানি নগর দেখিতে বড়ই সুন্দর বোধ হয়। কুণুর নামক কেদারবাহিনী ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী বাঁকিয়া বাঁকিয়া কোগ্রামের দক্ষিণ ও পূর্ব্বপার্শ্ব বেষ্টন করিয়া অজয়নদে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। কুণুরের উত্তরে ক্ষুদ্র প্রান্তর, পার্শ্বে 'আড়ওয়াল (আড়াল)' নামক ক্ষুদ্র পল্লীর ঘন পাদপশ্রেণী, দূরে উজানিকে আবৃত করিয়া ছোট ছোট গুল্ম হইতে অশ্বত্থ ও বট তরুগুলি নিবিড় ভাব ধারণ করিয়া রহিয়াছে, মধ্যে মধ্যে জটাজূটধারী তালতরুগুলির শীর্ষদেশ দেখা যাইতেছে, দূর হইতে উজানি যেন একটি বনভূমি বলিয়া মনে হইয়াছিল।

মঙ্গলকোট হইতে স্বল্পতোয়া কুণুর নদী পার হইয়া উত্তরমুখে কিঞ্চিৎ গমন করিলেই নাতি-বৃহৎ এক অশ্বত্থ তরুতলে কতিপয় বন্যবৃক্ষলতাচ্ছাদিত ধ্বংসপ্রায় একটি প্রাচীন মসজিদ্ দেখা যায়। এখন সেটি প্রায় ইষ্টকস্তূপ, তন্মধ্যে মসজিদের ভগ্নপ্রায় কিয়দংশ আজিও দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সে মসজিদ্‌টি ইষ্টক ও চূণ দিয়া গাঁথা হইয়াছিল। ইহা দুই হইতে তিন শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। ইহার কি নাম, স্থানীয় লোকে তাহা অবগত নহে। এই মসজিদের অতি নিকটে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম, গ্রামের নাম 'আড়ওয়াল'। তথায় যে কয়েক ঘর অধিবাসী আছে, তাহারা মোসলমান। এই ক্ষুদ্র আড়ওয়াল গ্রামটি দুই ভাগে বিভক্ত; মধ্য-ভাগে একটি শুষ্ক কেদারবাহিনী নদীর গর্ভ বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই শুষ্ক ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর গর্ভ অতিক্রম করিয়া আড়ওয়ালের উত্তর অংশ দিয়া গ্রামান্তরে যাইবার পথ প্রসারিত রহিয়াছে। গ্রামের এই অংশে আর একটি মসজিদের চিহ্ন মাত্র পড়িয়া রহিয়াছে। কুণুর নদীতীরে এক অজ্ঞাতনাম কাজির বাটীর ধ্বংসাবশেষ আছে। আজিও কাজির সানবাঁধা রোয়াক ও গৃহের মেঝের কিয়দংশ বিদ্যমান রহিয়াছে। অধিকাংশ গৃহচিহ্ন কুণুর-গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। কুণুরনদীর শুষ্কপ্রায় সামান্য জলধারা ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। নদীগর্ভ ইষ্টকস্তূপে প্রায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এই স্থানের নদীর 'আড়ানী' বড় উচ্চ। নদী-গর্ভে অবতরণ করিয়া আড়ানী-গাত্রে কোন প্রকার প্রাচীন চিহ্ন বর্ত্তমান আছে কি না, অনুসন্ধান করা হইল। ইষ্টকময় গৃহভিত্তি এবং মৃত্তিকাপাত্রের চূর্ণরাশি নদীপ্রবাহে মৃত্তিকা হইতে উন্মুক্ত হইয়া পড়িয়াছে, দেখা গেল। ক্রমে উত্তর অংশে মৃত্তিকাপাত্রচূর্ণপরিপূর্ণ একটি ডাঙ্গা পার হইয়া দু চারিটি বাব্‌লাগাছের পার্শ্ব দিয়া কোগ্রাম-সীমায় উপস্থিত হওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি, এ, মহাশয় ও তাঁহার কতিপয় বন্ধুবর্গ বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। ঘনবন্যবৃক্ষসমাকীর্ণ নিবিড় বনভূমির মধ্যস্থ একটি সঙ্কীর্ণ পথ ধরিয়া গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করা যায়। গ্রামটিও বনভূমি। সম্মুখে এক সুবৃহৎ বটবৃক্ষের পশ্চিম পার্শ্বে ভগ্নপ্রাচীর-বেষ্টিত প্রাঙ্গণমধ্যে একটি ক্ষুদ্র নবনির্ম্মিত ইষ্টকগৃহ দেখা গেল। ইহাই বর্ত্তমান কালের চণ্ডীর দেউল। এই স্থানেই মঙ্গলচণ্ডীর অবস্থান। ইহারই পার্শ্বে ধনপতি দত্ত সদাগরের বাসভবন ছিল।

মঙ্গলচণ্ডিকার মন্দির

মন্দিরপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে হইলে, পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া পূর্ব্বমুখে প্রবেশ করিতে হয়। বর্ত্তমান মন্দিরটি দক্ষিণদ্বার। দীর্ঘে ২২ ফিট্ ৬ ইঞ্চি, প্রস্থে ২১ ফিট্। মন্দিরমধ্যে কাঠের সিংহাসনের উপরে পিত্তলময়ী দশভুজা মহিষমর্দ্দিনী সিংহবাহিনী চণ্ডিকা দেবী বিদ্যমান রহিয়াছেন। তাঁহার সিংহাসনের পুরোভাগে একটি প্রস্তরের বৃষ। বামে প্রস্তরের পলতোলা কৃষ্ণবর্ণ লিঙ্গমূর্ত্তি—ইঁহারই নাম কপিলেশ্বর। তাঁহার বামে পদ্মাসনোপরি অবস্থিত ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি, তাঁহার বামে গৃহের কোণে একটি বৃহৎ খড়্গ। বুদ্ধমূর্ত্তিটি ঊর্দ্ধে ১′—৯″, প্রস্থে ১১′, স্থূল ৩″। উজানির মঙ্গলচণ্ডিকা পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং উজানি একটি পীঠস্থান মধ্যে গণ্য।

"উজানিতে কফোনি মঙ্গলচণ্ডী দেবী।
ভৈরব কপিলাম্বর শুভ যাঁরে সেবি॥"

—পীঠমালা।

তন্ত্রচূড়ামণি নামক তন্ত্রের মতে উজানি নামক স্থানে ভগবতীর কূর্পরদেশ পতিত হইয়াছিল এবং দেবী মঙ্গলচণ্ডীকা ও ভৈরব কপিলাম্বর তথায় নিয়ত অবস্থান করেন; কুব্জিকাতন্ত্রে মঙ্গলকোটে উক্ত পীঠস্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। শিবচরিত নামক সংগ্রহ-পুস্তকে উজানিতে পীঠস্থানের কথা লিখিত আছে ।

লোচনদাসের পাট

মঙ্গলচণ্ডিকা দেবীর দেউল হইতে গ্রামের মধ্য দিয়া কিঞ্চিৎ উত্তর-পূর্ব্বকোণে গমন করিলে 'লোচনদাসের পাটে' উপস্থিত হওয়া যায়। লোচনদাসের সমাধি-গৃহটি ক্ষুদ্র ও ইষ্টক-নির্ম্মিত। সমাধিগৃহের প্রাঙ্গণে দক্ষিণ মুখে প্রবেশ করিতে হয়। মন্দিরটি দক্ষিণ-দ্বারী। এই সমাধি-গৃহটি দীর্ঘে ১৫´ ফিট্ ৩´´ ইঞ্চি, প্রস্থে ১২´ ফিট্ ১´´ ইঞ্চি। গৃহের মধ্যে লোচনদাসের পিরামিডাকৃতি (Pyramidal) সমাধি বিদ্যমান রহিয়াছে। সমাধির উত্তরাংশে শ্রীশ্রীগৌর-নিতাই-এর মৃন্ময় মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সমাধিগৃহপ্রবেশের দ্বারের উভয় পার্শ্বে ভিত্তিগাত্রে সংবদ্ধ প্রস্তরের দুইটি চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি আবদ্ধ রহিয়াছে। মূর্ত্তিদ্বয় অতি সুন্দর ও অনুমান একাদশ কি দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত।

সমাধিমন্দিরের বাহিরে পূর্ব্বভাগে মাধবীলতার তলে ছোট বড় দশটি পিরামিডাকৃতি সমাধিচিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রাঙ্গণের দক্ষিণভাগে একটি ক্ষুদ্র ইষ্টক-নির্ম্মিত স্থান, তাহার তিনটি অংশ। উহার দুই পার্শ্বে দুইটি দেড় বা দুই হস্ত উচ্চ ছাদযুক্ত অতি ক্ষুদ্রদ্বারবিশিষ্ট গৃহ, মধ্যস্থল উন্মুক্ত। এই ক্ষুদ্র গৃহের পূর্ব্বপার্শ্বে উদয়চাঁদ মহান্তের সমাধি এবং পশ্চিমে বীরচাঁদ অবধূত গোসাঞির ও তাঁহার প্রসূতির সমাধি বিদ্যমান রহিয়াছে। এই দুই সমাধিস্থানের মধ্যস্থিত অংশে একটি সুন্দর কৃষ্ণ-প্রস্তরনির্ম্মিত জৈন তীর্থঙ্করমূর্ত্তি বিদ্যমান ছিল। এই মূর্ত্তিটি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের জন্য সংগৃহীত হইয়া কলিকাতায় আনিত হইয়াছে।

তীর্থঙ্করমূর্ত্তি-পরিচয়

মূর্ত্তিটি দিগম্বর, কাল প্রস্তরের উপর খোদিত, প্রস্তরটি উচ্চতায় ২৩৷৷৹ ইঞ্চি, প্রস্থে ১৪৷৷৹ ইঞ্চি, স্থূলতায় ৩ ইঞ্চি। মূর্ত্তির মস্তকে একটি ছত্র বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার দুই পার্শ্বে দুইটি ঢক্কা কোন অদৃশ্য বাদক কর্ত্তৃক ধ্বনিত হইতেছে। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, দুন্দুভিনিনাদ হইতেছে। তন্নিম্নে মালাহস্তে দুইটি উড্ডীয়মান অপ্সরোমূর্ত্তি, তাহাদের নিম্নে, মূর্ত্তির দক্ষিণ পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারিটি দেবমূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমটির বদন শ্মশ্রুবিমণ্ডিত, তাহার এক হস্তে গদা, অন্য হস্তে অভয়মুদ্রা।

দ্বিতীয় মূর্ত্তিটি ধ্যানমুদ্রায় অবস্থিত। তৃতীয়টির দক্ষিণ হস্তে গদা আর বামহস্তে জানুদেশ সংস্থাপিত। চতুর্থ মূর্ত্তির দক্ষিণ হস্তে অভয়মুদ্রা, বামহস্তে বরদ-মুদ্রা এবং তাহার শ্মশ্রুও বিদ্যমান রহিয়াছে। বামদিকের পাঁচটি মূর্ত্তির মধ্যে প্রথমটির দক্ষিণ হস্তে পদ্ম, বামহস্তে ঘট। দ্বিতীয় মূর্ত্তির দক্ষিণ হস্তে পদ্ম এবং বামহস্তে গদা, তন্নিম্ন মূর্ত্তির দুই হস্তেই পদ্ম বিরাজিত রহিয়াছে। চতুর্থটি পুরুষের উর্দ্ধাঙ্গের মূর্ত্তি, তাহার দুই হস্ত অস্পষ্ট, মস্তকে আভামণ্ডল রহিয়াছে। সর্ব্বনিম্ন মূর্ত্তির উপরার্দ্ধ কোন স্ত্রীলোকের প্রতিকৃতি এবং নিম্নার্দ্ধ সর্পপুচ্ছবৎ, তাহার দক্ষিণ হস্তে অসি ও বামহস্তে চর্ম্ম বিদ্যমান। এই নয়টি মূর্ত্তিই আসনে উপবিষ্ট। বিশেষ পরীক্ষার পর স্থির হইয়াছে যে, এই মূর্ত্তি নয়টি নবগ্রহের। ইঁহাদের নিম্নে তীর্থঙ্করের দুই পার্শ্বে দুইটি চামরধারী পুরুষ-মূর্ত্তি, তাহারই ন্যায় দুইটি পদ্মের উপর দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহার পরই পাদপীঠ আরম্ভ হইয়াছে। তাহার মধ্যভাগে তীর্থঙ্করের ঠিক পদতলে একটি শায়িত মৃগমূর্ত্তি; এই লাঞ্ছন দেখিয়া মূর্ত্তিটিকে ষোড়শতম তীর্থঙ্কর শান্তিনাথ অবধৃত বলা হইয়াছে।* মৃগের দক্ষিণ পার্শ্বে নিম্নে তাঁর কল্পিতমূর্ত্তি আর পাদপীঠে দুই ধারে দুইটি নৈবেদ্য।

লোচনদাসের পাটের বর্ত্তমান মহান্তের নাম হরিদাস মহান্ত, তিনি বাউলপন্থী সমাধি-প্রাঙ্গণের পূর্ব্বভাগে উক্ত বাবাজীর আখড়াবাড়ী।

অজয়নদ

কুগ্রাম বা কোগ্রামের উত্তর পার্শ্বে অজয়নদ। লোচনদাসের বাটী হইতে অজয় অতি নিকটে। আমরা অজয়তীরে এক অশ্বত্থমূলে গিয়া উপবেশন করিলাম। অজয় অতি বৃদ্ধ অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে, বালুকাস্তূপের অন্তরালে অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে পূর্ব্বমুখে প্রবাহিত। উদ্যম নাই, চঞ্চলতা নাই। অজয়ের এই অবস্থা দেখিয়া মনে হইল, ঘনরাম যে অজয়ের বর্ণনা করিয়াছেন, এ অজয় বুঝি সে অজয় নহে। ঘনরামের অজয় যথার্থই অজয় ছিল।

"প্রলয় দারুণ বাণ আইল হেন কালে।
তরল তরঙ্গ তেজে দুকূল উথলে॥
কল কল কবর কথন কানে কান।
দেখিতে দেখিতে বড় বেড়ে গেল বাণ॥"

ঘনরাম-ধর্ম্মমঙ্গল, অষ্টাদশ সর্গ।

বর্ত্তমান কালে অজয় কুগ্রাম গ্রাস করিতেছেন। কোগ্রামের তীরভূমি সুউচ্চ আড়ানী। এই স্থানের সমতল ক্ষেত্রে লোচনের স্মরণার্থ উজানির মেলা বসিয়া থাকে।

---

* Ind. Ant. Vol. II, p. 138.

কুণুর-সঙ্গমস্থল

এই স্থান হইতে পূর্ব্বমুখে অগ্রসর হইলে, অজয় ও কুণুরের সঙ্গমস্থল। অজয় ও কুণুর-সঙ্গমের পশ্চিমেই উজানির মহাশ্মশান-ভূমি।

এই উজানির মহাশ্মশানের এক পার্শ্বে 'খড়্গমোক্ষণ' নামক পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। ইহার পার্শ্বেই 'খাড়গড়া', তৎপরেই নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলের দক্ষিণপার্শ্বে কবিকঙ্কণ-চণ্ডীকাব্যোক্ত 'ভ্রমরার দহ'। প্রাচীন 'ভ্রমরার দহ' উপস্থিত বালুকাস্তূপ ও পলিমাটী পড়িয়া কৃষিভূমিতে পরিণত হইয়াছে।

খড়্গমোক্ষণ

সম্বন্ধে যে দুইটি প্রবাদ এতদঞ্চলে প্রচলিত আছে, তাহা সংক্ষেপে লিখিত হইল।

প্রথম—বিক্রমাদিত্য নামে কোন নরপতি বেতালসিদ্ধি ব্যাপারে খড়্গাঘাতে জনৈক সন্ন্যাসীর শিরশ্ছেদন করেন। ব্রহ্মহত্যাপরাধে সেই খড়্গ সেই রাজার হস্তে সংলগ্ন হইয়া থাকে। বহুতীর্থ-ভ্রমণের পর উজানির এই মহাশ্মশানে অজয়নদতীরে খড়্গ হস্ত হইতে চ্যুত হইয়া পড়ে এবং মহারাজ পাপ হইতে মুক্তিলাভ করেন।

দ্বিতীয়—এক ব্যক্তি খড়্গদ্বারা তাহার ভ্রাতার মস্তক ছেদন করে। এই ভ্রাতৃহত্যারূপ মহাপাপে সেই খড়্গ তাহার হস্তে সংলগ্ন হইয়া যায়। এই 'খড়্গমোক্ষণ' বলিয়া খ্যাত প্রান্তরে আসিলে তাহার সেই মহাপাপ-বিমোচনের প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ হস্তসংবদ্ধ খড়্গ স্খলিত হয়। এই উভয় প্রবাদবশতঃ এই খড়্গমোক্ষণের মাঠ তীর্থরূপে বিবেচিত হইয়া থাকে। অদ্যাপি পৌষসংক্রান্তির দিনে এই স্থানে স্নানার্থ বহু লোকসমাগম হইয়া থাকে এবং এই স্থানে একটি মেলা বসে। ইহার পার্শ্বেই

মাড়গড়া

নামক স্থান। এই স্থানটির নাম 'মাড়গড়া' কেন হইয়াছে, জিজ্ঞাসা করায় শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক মহাশয় বলিলেন, এই স্থানে অজয়ের ধারে ধনপতি দত্ত সদাগরের দ্বিতীয়া স্ত্রী খুল্লনা ছাগী চরাইবার সময় বিশ্রাম করিতেন। প্রবাদ এই যে, খুল্লনা এই স্থানে ভাত রাঁধিয়া ভাতের মাড় গালিয়া ফেলিতেন।

ভ্রমরার দহ

খড়্গমোক্ষণ ও মাড়গড়ার অনতিপূর্ব্বভাগে কুণুর ও অজয়সঙ্গম-পার্শ্বে ভ্রমরার দহ। উজানি যখন বণিক্-সমাকুল ছিল, তখন এই ভ্রমরার দহে তাঁহাদের বাণিজ্য তরণী লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া শোভা পাইত। ধনপতি এই ভ্রমরার দহে ডিঙ্গায় চাপিয়া সিংহলে বাণিজ্য করিতে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র শ্রীমন্ত দত্ত এই ভ্রমরার দহে সাতখানি সমুদ্রগামী পোত ভাসাইয়া সিংহলে পিতার অনুসন্ধানে গমন করেন।

"প্রথমে ভ্রমরাজলে, শ্রীমন্ত নৌকায় চলে,
পূজিয়া মঙ্গলচণ্ডিকায়।
এড়ায় ভ্রমরা-পাণি, সম্মুখেতে উজানি,
নিজ-গ্রাম এড়াইয়া যায়॥"—কবিকঙ্কণ

বণিকেরা যখন সফরে বাহির হইতেন না, তখন তাঁহাদের ডিঙ্গাগুলি ভ্রমরার জলে নিমগ্ন থাকিত। বাণিজ্য-গমনের পূর্ব্বে জল হইতে নৌকাগুলি তুলিয়া মেরামত ও গাবকালী করাইয়া ব্যবহার করিতেন। ভ্রমরার দহ তখন খুব গভীর ছিল। ডুবুরী নামাইয়া ডিঙ্গা-গুলি তুলিতে হইত।

"পূর্ব্ব হইতে ছিল ডিঙ্গা ভ্রমরার জলে।
ডুবুরী লইয়া সাধু গেল তার কূলে॥
ঘাটে জলদেবতার করিল পূজন।
জলেতে ডুবুরী গিয়া নামে দুই জন॥"—কবিকঙ্কণ

এই ভ্রমরার জলে ধনপতির মধুকর, দুর্গাবর, শঙ্খচূড়, চন্দ্রবাল, ছোটমুখী, গুয়ারেখী ও নাটশাল নামক সাতখানি সুবৃহৎ নৌকা নিমগ্ন ছিল।

শ্রীমন্তের ডাঙ্গা

মঙ্গলচণ্ডীর দেউল হইতে পূর্ব্বদিকে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেই দক্ষিণভাগে একটি সুবৃহৎ উন্নত ডাঙ্গার উপর বৃহৎ অশ্বত্থতরু বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই স্থানটি প্রাচীন কালে লোকবাস-ভূমি ছিল বলিয়া বিবেচনা হয়। বর্ত্তমান কালে এই স্থানটি বনাবৃত অবস্থায় রহিয়াছে। এই স্থানের অনতিপূর্ব্বভাগে একটি উন্মুক্ত উচ্চ ভূখণ্ড বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহাতে মধ্যে মধ্যে আকন্দ পুষ্পের ক্ষুদ্র গাছ হইয়াছে, এই স্থানের নাম শ্রীমন্তের ডাঙ্গা। ডাঙ্গার অনতি উত্তরে অজয়নদ এবং পূর্ব্বভাগে ক্ষীণ কুণুরনদী প্রবাহিত। শ্রীমন্ত পিতার সন্ধানে সিংহলে যাইবার জন্য মঙ্গলচণ্ডীর দেউলে মহামায়াকে পূজা ও প্রণাম করিয়া যাত্রা করেন এবং গৃহ হইতে নিক্রান্ত হইয়া প্রথমে এই ডাঙ্গায় দাঁড়াইয়া অনতিদূরস্থ ভ্রমরার দহের পোতগুলি দেখিয়াছিলেন। শ্রীমন্ত যাত্রা করিয়া এই স্থানে প্রথমে দাঁড়াইয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানের নাম 'শ্রীমন্ত-ডাঙ্গা' হইয়াছে। এই স্থানে জননী খুল্লনা শ্রীমন্তকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

'খুল্লনা বলেন ছিরা শুন মোর বাণী।
বিপদে রাখিবে তারা নগেন্দ্রনন্দিনী॥"—কবিকঙ্কণ

বর্ত্তমান কালে কোগ্রামনিবাসী নরনারীগণ বিজয়াদশমীর দিবস দেবীর ঘট-বিসর্জ্জনের পর মঙ্গলচণ্ডীর দেউলে গমন করিয়া মহামায়ার চরণে প্রণাম করিয়া, এই শ্রীমন্ত-ডাঙ্গায় আগমন করিয়া যাত্রা করেন। শ্রীমন্ত এই স্থানে যাত্রা করিয়া সিংহলে গমনপূর্ব্বক সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানের প্রতি সাধারণের যথেষ্ট ভক্তি ও বিশ্বাস রহিয়াছে।

মঙ্গলকোটের বর্ত্তমান দর্শনীয় স্থান

মঙ্গলকোট-পরিক্রমণ

মঙ্গলকোটের পুলিশ-ষ্টেসনটি অতি উচ্চ ভূখণ্ডের উপর অবস্থিত, কুণুর নদীতীরস্থ সমতলক্ষেত্র হইতে এই স্থানের উচ্চতা পঁচিশ হইতে ত্রিশ ফিট্ হইবে। অতি সুন্দর স্থান। যখন মঙ্গলকোট সজীব ছিল, তখন এই স্থান কোন দেবালয় বা ধনী জনগণের হর্ম্ম্যাবলীতে পরিশোভিত ছিল বলিয়া মনে হয়। স্থানটির চতুর্দ্দিক্ ইষ্টক-সমাকীর্ণ ও ভূপরি ইষ্টক-নির্ম্মিত বহু গৃহভিত্তির চিহ্ন পরিলক্ষিত হইয়াছিল। এই স্থানটির দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর-ভাগে নিম্নভূমি। পুলিশ-ষ্টেসনটি যেন একটি অন্তরীপের নাসাগ্রে অবস্থিত। এই স্থান হইতে চতুর্দ্দিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব মনোজ্ঞ। এই স্থানের পশ্চিমাংশে অশ্বত্থ, খেজুর ও বিবিধ বন্যবৃক্ষে একটি কুঞ্জবাটিকার সৃষ্টি করিয়াছে। সেই স্বভাবজাত কুঞ্জবনের মধ্যে কয়েকটি ইষ্টক-নির্ম্মিত সমাধি ভগ্নাবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে। এই স্থানে

গোলাম পঞ্জতন

নামক পাঁচ জন গাজী চিরনিদ্রায় নিদ্রিত আছেন। তাঁহারা মঙ্গলকোট অধিকার করিতে আসিয়া জনৈক হিন্দু নরপতির হস্তে নিহত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ। শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত মোলবী মহম্মদ ইস্মাইল সাহেব আমাদিগকে মঙ্গলকোটের মোসলমান অধিকারকাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত বহু কাহিনী সংগ্রহ করিয়া দেন। উক্ত মৌলবী সাহেব মঙ্গলকোট-পরিক্রমের প্রধান পাণ্ডা হইয়াছিলেন। তাঁহার সাহায্যে মঙ্গলকোটের দর্শনীয় স্থানগুলি অনায়াসে দর্শন এবং প্রত্যেক স্থানের প্রাচীন কাহিনী শ্রবণ করিয়াছি।

গোলাম পঞ্জতনের সমাধিস্থান হইতে পূর্ব্বমুখে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে, উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত একটি গ্রাম্য পথের সহিত আমাদের গন্তব্য পথ মিশিয়া গেল। এই স্থানের ঠিক পূর্ব্বদিকে চতুর্দ্দিকে ইষ্টক-নিক্ষিপ্ত ভগ্ন প্রাচীরবেষ্টিত একটি নূতন মসজিদ্ দেখা গেল। মসজিদ্‌টির বাহিরের প্রাঙ্গণে পূর্ব্বমুখে প্রবেশ করিয়া মূল মস্‌জিদ্-প্রাঙ্গণে উত্তর-মুখে প্রবেশ করিতে হয়। এই মস্‌জিদের নাম

কোয়ার সাহেবের মস্‌জিদ্

প্রাচীন মস্‌জিদ্‌টি ভগ্ন হইবার পর উহার স্থানে এই মস্‌জিদ্‌টি নির্ম্মিত হইয়াছে। এই মস্‌জিদের সম্মুখে একখানি খোদিত শিলাফলক সংবদ্ধ রহিয়াছে। ইহা হইতে হিঃ ১২২৫ সালে ইহা সংস্কৃত হইয়াছে বলিয়া অবগত হওয়া যায়।

মস্‌জিদের উত্তর অংশ প্রাচীর-বেষ্টিত। তথায় কয়েকটি প্রাচীন ধরণের সমাধি বিদ্যমান রহিয়াছে। এই স্থানে চারিটি প্রস্তরগ্রথিত পয়ঃপ্রণালী বিদ্যমান রহিয়াছে।

মৌলবী সাহেব ফাকিরের মস্‌জিদ্

কোয়ার সাহেবের মস্‌জিদ্ ত্যাগ করিয়া দক্ষিণদিকে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া পূর্ব্বমুখে

খানিক পথ অতিবাহিত করিলেই ডাহিন ভাগে একটি প্রাচীন ভগ্ন মস্‌জিদ্ নয়নগোচর হয়। এই মস্‌জিদের দ্বার পূর্ব্বমুখে। মস্‌জিদ্‌টি প্রাচীন ধরণের ও বহির্দ্দেশ বাঙ্গালা ঘরের আকারে নির্ম্মিত। গৌড়ের কদমরসুল মস্‌জিদ্ যে ধরণের, ইহার আকার ও গঠন কতকটা সেই প্রকার। অনেকে এই মস্‌জিদের নাম বলিতে পারিলেন না। কেহ বলিলেন, "মৌলবী সাহেব ফকীরের মস্‌জিদ্।"

মঙ্গলকোটের হাট

এই মস্‌জিদের নিকট হইতে পূর্ব্বমুখে আন্দাজ এক রশি গমন করিলে বামে দাতব্য চিকিৎসালয় এবং তাহারই পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্ন স্তূপ দৃষ্টিগোচর হয়। ভগ্ন স্তূপের উত্তরে একটি ক্ষুদ্র হাট, সেই দিন বসিয়াছিল।

মৌলানা হামিদ দানেশমন্দের মস্‌জিদ্

মঙ্গলকোটের হাটের দক্ষিণেই দুই শত পঞ্চাশ বর্গ ফিট্ পরিমাণ ভূখণ্ডের উপর একটি বাসভবনের চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই বাসভবন তিন ভাগে বিভক্ত,—সর্ব্ব পশ্চিমের অংশে মস্‌জিদ্ ও সমাধিক্ষেত্র, তৎপরে দুই খণ্ড দুই জনের সদর ও অন্দর বিশিষ্ট বাসভব ছিল। হাটের উপর দিয়া দক্ষিণমুখে উক্ত প্রাচীন বাসভবনে প্রবেশ করা যায়। যে স্থান দিয়া প্রবেশ করিতে হয়, সেই স্থানটি উক্ত বাটী-প্রবেশের প্রধান দ্বার। দ্বারের উপর

নাকারাখানা

ছিল। উক্ত নাকারাখানা ১৮ বর্গ ফিট্ পরিমাণ ভূমির উপর নির্ম্মিত ছিল। এই দ্বার দিয়া দক্ষিণ মুখে কয়েক হস্ত অগ্রসর হইলেই একটি কাঠচাঁপা বৃক্ষ দেখা যায়। এই স্থানের পশ্চিমাংশেই একটি নবনির্ম্মিত মস্‌জিদ্। মস্‌জিদ্-প্রাঙ্গণে পশ্চিম মুখে প্রবেশ করিতে হয়। প্রাঙ্গণটি বাঁধান। প্রাচীন ভগ্ন মস্‌জিদ্‌টির ইষ্টকরাশি অপসারিত করিয়া সেই স্থানে সেই প্রাচীন মস্‌জিদ্ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্রাকারের এই মস্‌জিদ্‌টি নির্ম্মিত হইয়াছে। অদ্যাপি সেই প্রাচীন মস্‌জিদের কোণের একটি স্তম্ভ বা মিনার বিদ্যমান রহিয়াছে। এই নূতন মস্‌জিদে একখানি তোগড়া-অক্ষরমালা-খোদিত শিলাফলক আবদ্ধ রহিয়াছে। এই শিলালিপি হইতে জানা গিয়াছে যে, ১০৬৫ হিজরিতে সম্রাট্ সাজাহানের রাজত্বকালে প্রাচীন মস্‌জিদ্‌টি নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই মস্‌জিদের দক্ষিণপার্শ্বে কারুকার্য্য-খচিত বাঙ্গালা ধরণের একটি ক্ষুদ্র গৃহের মধ্যে

মৌলানা হামিদ দানেশমন্দের সমাধি

বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহার দ্বারদেশ কাঠের খুপ্‌রিকাটা কপাটদ্বারা বদ্ধ রহিয়াছে। সমাধিগৃহটি দীর্ঘে ২২ ফিট্ ২ ইঞ্চি। এই সমাধিগৃহের সম্মুখভাগে মৃত্তিকোপরি বাঙ্গালার স্বাধীন রাজা সুলতান হোসেন সাহের সময়ে উৎকীর্ণ লিপিযুক্ত একখানি প্রস্তর পতিত

রহিয়াছে। এই প্রস্তরের খোদিত লিপিটি বাঙ্গালার সুলতান আলাউদ্দীন্ হোসেন সাহের রাজত্বকালে ৯১৬ হিজিরিতে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

মৌলানা দানেশমন্দের সমাধির দক্ষিণে আর একটি ক্ষুদ্র সমাধিগৃহ বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাহাতে

মিঞা হজ্জৎ উল্লা শাহ

নামক জনৈক ব্যক্তি চিরনিদ্রায় নিদ্রিত রহিয়াছেন। ইহার সম্মুখে তাঁহার স্ত্রী সাহেলা বিবির সমাধি বিদ্যমান রহিয়াছে। এই স্থানের দক্ষিণভাগ বহু সমাধি-চিহ্নে চিহ্নিত রহিয়াছে। তাহার দক্ষিণে একটি চতুষ্কোণ পুষ্করিণী। একদিন এই পুষ্করিণীটির চারিদিক্ সোপান-শ্রেণীতে শোভিত ছিল, তাহার চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই পুষ্করিণীর নাম

মাইনে পুকুর

মাইনে পুকুরে স্নান করিয়া মৌলানা হামিদ দানেশমন্দের সমাধিপ্রাঙ্গণে দেহ লুণ্ঠন করিলে বহুপ্রকার চর্ম্মরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে, এ প্রকার বিশ্বাস এতদঞ্চলে বিশেষভাবে বদ্ধমূল রহিয়াছে। এই পুষ্করিণীর পশ্চিম পাহাড়ে সুবৃহৎ বহু ইষ্টকগৃহ-শোভিত

কাজি খোদা নওয়াজ

সাহেবের বাসভবন ছিল। এক্ষণে ইহার বহু অংশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়া গিয়াছে। কাজি সাহেব একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন।

বাঁধাপুকুর ও হামামখানা

মৌলানি হাজি দানেশমন্দের ও মিঞা শা হজ্জৎ উল্লার বাসভবনের উত্তরে প্রায় ৭৫ ফিট্ দীর্ঘ এবং ৫০ ফিট্ প্রস্থ জলভাগময় একটি সুন্দর পুষ্করিণী রহিয়াছে। যখন এই সকল স্থান সৌধমালায় শোভিত ছিল, তখন এই পুষ্করিণীর চতুষ্পার্শ্ব ইষ্টক-গ্রথিত সোপানাবলীতে পরিশোভিত ছিল। আজিও তাহার চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। আজিও জলের উপর ৩০টি সোপান বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই বাঁধা পুষ্করিণীর বিশেষ কোন নাম নাই। দেশের লোকে বাঁধাপুকুর বলিয়া থাকে। ইহার পূর্ব্বদিকে সুন্দর ইষ্টকময় হাউজখানা বা হামাম্খানা বিদ্যমান ছিল। এখন তাহার কতক চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই পুষ্করিণীর জল নলপথে উক্ত গৃহে প্রবেশ করিত। এই পুষ্করিণীর জল অন্য এক প্রকাণ্ড বাঁধান সুরঙ্গপথে মৃত্তিকা-ভ্যন্তর দিয়া আট দশ রশি দূরে

ফুলবাগে

জল সরবরাহ করিত। প্রবাদ,—মাইনে পুকুর, বাঁধাপুকুর ও ফুলভাগের পুকুর এই তিনটি পুষ্করিণীতে মৃত্তিকাভ্যন্তর দিয়া নলপথে জলের সংযোগ ছিল। বাঁধাপুকুর হইতে পূর্ব্বভাগে 'ফুলবাগে' যাইবার পথ। বর্ত্তমানকালে ফুলবাগে আর ফুলগাছ নাই, ইক্ষুক্ষেত্র, আলুর ক্ষেত্র ইত্যাদিতে শোভিত রহিয়াছে। ফুলবাগে একটি ছোটখাট পুষ্করিণী আছে। তাহার

উত্তর দিকের ঘাটটি বাঁধান ছিল। ঘাটটি প্রস্থে ৭১ ফিট ৬ ইঞ্চি। পুষ্করিণীর পশ্চিম ধারে একটি সুন্দর ইষ্টকগৃহ ছিল। সাধারণে সেই গৃহটিকে

ফুলবাগের হাউজ ঘর

বলিয়া থাকে। ইহা অতি প্রাচীন। এই হাউজঘরটি দৈর্ঘে ৫০ ফিট্ এবং প্রস্থে ৪০ ফিট্ মাত্র। পুষ্করিণীর দিকে হাউজগৃহের মধ্যগত একটি বাঁধান "ইঁদারা" দেখা যায়। ইহা ইষ্টক ও লতাপাতায় বুজিয়া গিয়াছে। ইঁদারার ব্যাস ৫´ পাঁচ ফিট্ ৮´´ আট ইঞ্চি। হামামখানার পশ্চিমে ভিত্তিগাত্রে তিনটি মৃত্তিকানলের ছিদ্রমুখ পর পর উপরি উপরি বর্ত্তমান রহিয়াছে দেখা যায়। উক্ত নল দিয়া হাউজঘরে ফোয়ারার জল উঠিত এবং তথা হইতে ফুলবাগে বিতরিত হইত। উক্ত নলের মুখের ব্যাস ৬´´ ইঞ্চি।

গ্রামের পূর্ব্ব-দক্ষিণভাগ বেষ্টন করিয়া আসিবার সময় আমরা একটি নামহীন ভগ্ন মস্জিদ্ দেখিতে পাই। তথায় কয়েকটি বাঁধান কবর ছিল। তৎপরে পুনশ্চ পুলিশ ষ্টেসনে আসিয়া বিশ্রামের পর অপরাহ্নে মঙ্গলকোটের উত্তরাংশ পরিভ্রমণে গমন করা গেল। কোয়ার সাহেবের মস্জিদের উত্তর পার্শ্ব দিয়া পূর্ব্বমুখে সুউচ্চ ভূভাগের উপর দিয়া গমনকালে বহু বাসভবনের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। সম্মুখে একটি উন্মুক্ত উন্নত ক্ষেত্র, তথায় বৃক্ষাদি নাই। খোলামকুচি, ইটের কুচিতে সেই স্থানটি বিছান রহিয়াছে। ডাঙ্গার মধ্যস্থলে বৃষ্টির জলপরিমাণ-জ্ঞাপক যন্ত্র স্থাপিত রহিয়াছে। এই স্থানটির নাম

বিক্রমাদিত্যের ডাঙ্গা বা বিক্রমজিতের বাড়ী

বিক্রমাদিত্যের রাজভবনের আর কোন চিহ্ন বর্ত্তমান নাই। চিহ্নগুলি বিবিধ কারণে কালের স্রোতে ধুইয়া মুছিয়া লইয়া গিয়াছে। কেবল স্মৃতি জাগাইবার জন্য নামটি বর্ত্তমান আছে। পতিত উন্নত ভূমিটির পরিমাণ আন্দাজ কুড়ি পঁচিশ বিঘা হইবে। ইহার আয়তন আরও বৃহৎ ছিল, এই স্থলের অবস্থা দর্শনে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। বিক্রমাদিত্যের বাসভবনের অধিকাংশ অংশ সাধারণের বাসভবনে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে অনেক উদ্বাস্তু হইয়া পড়িয়া আছে। চতুর্দ্দিক্ ঘুরিয়া দেখিলে বোধ হয়, অনুমান দুই শত বিঘা লইয়া একটি বাড়ী ছিল। গ্রামবাসীর অধিকারে আসিতে আসিতে এই সামান্য মাত্র স্থান পতিত রহিয়াছে। এই স্থানের উত্তর-পশ্চিমাংশ আরও উচ্চ, তথায় ইষ্টক-মণ্ডিত কতকগুলি সমাধি বিদ্যমান রহিয়াছে। এই স্থানে নাকি

গজনবী গাজী

চিরনিদ্রায় নিদ্রিত রহিয়াছেন। তাঁহার পরিবারবর্গ ও আত্মীয়-স্বজনের মৃতদেহ এই স্থানে সমাহিত করা হইয়াছে। ইহাও বিক্রমাদিত্যের গড়ের এক অংশ। এই বিক্রমাদিত্যের বাড়ী নামক ডাঙ্গাটি মঙ্গলকোটের অর্থাৎ প্রাচীন গড়বেষ্টিত স্থানের ঠিক মধ্যভাগে অবস্থিত ছিল। এই স্থানে রাজার প্রাসাদ ছিল। এই রাজপ্রাসাদ মঙ্গলকোট নামক দুর্গ দ্বারা অভিরক্ষিত ছিল।

"উজানি নগর অতি মনোহর
বিক্রম-কেশরী রাজা।"

এই সেই উজানিরাজ বিক্রমকেশরীর রাজবাড়ীতে আমরা দাঁড়াইয়া রহিয়াছি। উজানির "মঙ্গলকোট" নামক দুর্গ অধিকার করিবার জন্য

সপ্তদশ গাজী বা পীরের

প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হয়, তবে মঙ্গলকোট মোসলমানের হস্তগত হয়। মঙ্গল-কোটের অধিবাসিগণ বর্ষাকালে বা খুব এক পসলা বৃষ্টি হইলে পর এই রাজবাড়ীর উপর, পথে ঘাটে সোণা খুঁজিয়া বেড়ায়। অনেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বর্ণকণা প্রাপ্ত হয়। এই স্থানে অনেকে অনেক প্রকার ধাতব দেবদেবী-মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। এই স্থান হইতে বা মঙ্গলকোটের বহু স্থান হইতে অনেকে অনেক অর্থও প্রাপ্ত হইয়াছে। এই বিক্রমাদিত্যের ডাঙ্গা বা বাড়ী খনন করিলে বহু প্রাচীন নিদর্শন প্রাপ্তির সম্ভব রহিয়াছে। উচ্চ ভূখণ্ড হইতে জল গড়াইয়া নিম্নভূমিতে পড়াতে অনেক স্থানের মৃত্তিকা কর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। উন্নত ডাঙ্গা কাটিয়া একটি পথও নির্ম্মিত হইয়াছে। সেই পথের ধারে ডাঙ্গার একাংশে প্রাচীন প্রথায় গ্রথিত ইষ্টকের সুবৃহৎ স্তূপের নিম্নভাগ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, দেখা গিয়াছে। এই স্থানে সুবৃহৎ ইষ্টকালয় থাকার ইহাই একটি চিহ্ন বলিতে হইবে। এই ডাঙ্গাটি অন্য জমি হইতে বিশ ফিট্ উচ্চ হইবে এবং যে অংশে কবর রহিয়াছে, সেই অংশের উচ্চতা ত্রিশ ফিটের কম হইবে না।

বামে 'ভাদুপাড়' দৃষ্ট হয়। উত্তর মুখে কয়েক রশি পথ অতিক্রম করিয়া উত্তর-দক্ষিণে বিস্তীর্ণ একটি প্রকাণ্ড দীঘি দেখা গেল। তাহা যথেষ্ট জলচর পক্ষীতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। এই দীঘির নাম

মজলিসদীঘি

এই মজলিসদীঘির পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া উত্তরমুখে দীঘি অতিক্রম করিলেই সম্মুখে উন্নত ভূখণ্ডের উপর সুবৃহৎ একটি ভগ্ন মস্‌জিদ্ দৃষ্টিপথে পতিত হয়। মস্‌জিদের উপর বটতরু বিরাজ করিতেছে। এই মস্‌জিদের নাম

বড়বাজারের মস্‌জিদ্ বা হোসেনশাহী মস্‌জিদ্

প্রায় কুড়ি পঁচিশ ফিট্ উচ্চ ভূখণ্ডোপরি লোহিতবর্ণের এক বৃহৎ মস্‌জিদ্ ছাদহীন-প্রায় ভগ্নাবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। উত্তর ও দক্ষিণের মস্‌জিদ্‌গাত্র ধূলিতে মিশাইয়া গিয়াছে। মস্‌জিদের সম্মুখে অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে

রাজদীঘি

নামক একটি চতুষ্কোণ বৃহৎ পুষ্করিণী বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহার পূর্ব্বপার্শ্ব দিয়া কাটোয়া গমনের পাকা রাস্তা প্রসারিত রহিয়াছে। মস্‌জিদ্‌টি যে স্থলে নির্ম্মিত হইয়াছে, এই স্থানটি

উন্নত করিবার জন্য রাজদীঘির কর্ত্তনকালে সমুদায় মাটী পশ্চিম পাহাড়েই জমা করা হইয়াছিল। অন্য তিনটি পাড়ে আদৌ মাটীর স্তূপের চিহ্ন নাই।

মস্জিদটি চতুষ্কোণ, সম্মুখে ও পশ্চাতে পাঁচটি করিয়া খিলান বিদ্যমান রহিয়াছে। দক্ষিণ ও উত্তরদিকের দেওয়ালে দুইটি করিয়া দ্বার ছিল। সম্মুখভাগের দেওয়ালের বাহির দিকে বিবিধ প্রকারের খোদিত ইষ্টক-সমবায়ে আম্রশাখা ও লতা-পুষ্প-পাতার আকৃতি অঙ্কিত রহিয়াছে। মস্জিদের এই সব অলঙ্কার এখন একে একে খসিয়া পড়িতেছে। গত ভীষণ ভূমিকম্পে এই মস্জিদের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে।

প্রত্যেক খিলানের অধোদেশে পাথরের "হাসকল" ও কবাট পরাইবার স্থান-চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাতে বোধ হয়, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কপাট দ্বারা মস্জিদের প্রবেশপথ বন্ধ করিয়া রাখা হইত।

খিলানগুলি প্রায় ১৫ ফিট্ উচ্চ। উত্তরদিকের খিলানটি পড়িয়া গিয়াছে। প্রত্যেক খিলানের অভ্যন্তরদেশ সুন্দর কারুকার্য্যবিশিষ্ট। অভ্যন্তরদেশ ইষ্টক দ্বারা আচ্ছাদিত, তাহার ঊর্দ্ধে প্রস্ফুটিত পদ্ম খোদিত রহিয়াছে। দুই খিলানের মধ্যস্থিত প্রাচীরগাত্রের স্তম্ভ প্রস্তর দ্বারা গঠিত। স্তম্ভের পাদদেশে একখানা প্রশস্ত প্রস্তর, তাহার উপরে তদপেক্ষা আকৃতিতে ছোট আর একখানা প্রস্তর। এইরূপ পরস্পর প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত প্রস্তরের সমষ্টিতে সমস্ত স্তম্ভগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে। স্তম্ভসকলের পাদদেশের প্রস্তরগুলি গৃহতলের উপর স্থাপিত এবং তাহার সমসূত্রে আর একসারি প্রস্তর ভিত্তিগাত্রে সংবদ্ধ থাকিয়া গৃহতলের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। এইরূপভাবে আর এক সারি প্রস্তর স্তম্ভসকলের শিরোদেশস্থ প্রস্তরের সমান্তরালে চতুর্দ্দিকের প্রাচীরের গাত্রে বিদ্যমান ছিল। ভিত ৭´ সাত ফিট্ ৩´´ তিন ইঞ্চি পুরু। এই মস্জিদটি দীর্ঘে ৯১´ ফিট্ ও প্রস্থে ৬১´ ফিট্; চারি কোণে চারিটি মিনারেট ছিল। মস্জিদের অভ্যন্তরভাগে দেওয়ালগাত্রে কয়েকটি কুলুঙ্গী ছিল।

এই মস্জিদে যে সমুদায় প্রস্তর ব্যহৃত হইয়াছে, তাহা এক শ্রেণীর নহে এবং সমস্ত প্রস্তরগুলি সমানভাবে মসৃণ করা হয় নাই। প্রস্তরগুলির আকৃতি ও গঠন দেখিলেই মনে হইবে, ইহা এই মস্জিদের জন্য প্রস্তুত হয় নাই। পূর্ব্বে এই সমুদায় প্রস্তর অন্য কোন গৃহে ব্যবহার করা হইয়াছিল। তথায় বিভিন্ন উদ্দেশ্য সংসাধনার্থ প্রস্তরসমূহের ব্যবহার হইয়াছিল। এ স্থানে আনিয়া মস্জিদের উপযোগী করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা যথাযথস্থানে সংবদ্ধ করা হয় নাই।

চন্দ্রসেন রাজার নামাঙ্কিত শিলাফলক

মস্জিদের সম্মুখভাগের অভ্যন্তরদিকে, মধ্যপ্রবেশদ্বারের বামদিকের স্তম্ভের পাদদেশের প্রস্তরখণ্ডে "শ্রীচন্দ্রসেন নৃপতি"র নাম প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে খোদিত রহিয়াছে। এইরূপ অক্ষরমালা-খোদিত আর চারিখানি প্রস্তর উক্ত মস্জিদ্-অভ্যন্তরের দেওয়ালস্থিত প্রস্তরে দেখা গিয়াছে।

বোধ হয় একখানা প্রকাণ্ড প্রস্তরে শ্রীচন্দ্রসেন রাজার একটি খোদিত লিপি পূর্ব্ববর্ত্তী কোন দেবালয়ের কোন প্রস্তরখণ্ডে উৎকীর্ণ ছিল। মোসলমানগণ তাহা ভাঙ্গিয়া, কয়েক খণ্ডে বিভাগ করিয়া বর্ত্তমান মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ কালে ব্যবহার করিয়াছিল। এই অক্ষর-মালাখোদিত প্রস্তরখণ্ডগুলি মস্‌জিদের উপযোগী করিয়া লইবার জন্য শিল্পিগণ পল তুলিতে গিয়া অক্ষরমালার অধিকাংশ কর্ত্তন করিয়া তুলিয়া ফেলিয়াছে। যাহা সামান্য অবশিষ্ট আছে, তাহা হইতেই শ্রীচন্দ্রসেন নৃপতির নাম উদ্ধার হইয়াছে।

মিহ্‌রাব

পশ্চাদ্ভাগের দেওয়ালের ভিতরদিকে তিনটি মিহ্‌রাব আছে। মিহ্‌রাবের কতক অংশ প্রস্তরে ও কতক অংশ ইষ্টকে নির্ম্মিত। ইহা একার্দ্ধ কর্ত্তিত গম্বুজের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট এবং ইষ্টকময় প্রস্ফুটিত পদ্মপুষ্প দ্বারা সুশোভিত। নীচে এক সারি কল্‌কা ও তন্নিম্নে দুই সারি চৌখুপী কাজকরা আছে। উত্তর ও দক্ষিণদিকের মিহ্‌রাব দুইটি সম্পূর্ণভাবে ইষ্টকদ্বারা নির্ম্মিত এবং পূর্ব্ববৎ কারুকার্য্যেশোভিত।

গাড়ার গাঁথুনি

মস্‌জিদের দেওয়ালের মধ্যভাগ ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইষ্টকরাশি দিয়া পূর্ণ করা হইয়াছিল এবং উক্ত অংশের গাঁথুনির জন্য 'খোলাম্‌কুচি'-বিশিষ্ট মৃত্তিকা ব্যবহার হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে উক্ত অংশে চিত্রবিচিত্র করা পূর্ণ ও সমস্থল ইষ্টকও দেখা যায়।

এই মস্‌জিদে আরবী ও পারসী ভাষায় লিখিত কোন লিপি দৃষ্ট হয় না। মঙ্গলকোটের বৃদ্ধ মৌলবী মহম্মদ ইস্‌মাইল সাহেব বলেন যে, এই মস্‌জিদের শিলালিপিটি সাজাহানের সময়ে নির্ম্মিত মস্‌জিদে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। পূর্ব্বেই উক্ত শিলালিপির কথা বলা হইয়াছে। উহা সুলতান্ আলাউদ্দীন্ হোসেন শাহের রাজত্বকালে ৯১৬ হিজরিতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই মস্‌জিদ্‌টির নির্ম্মাণপ্রণালী দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয় যে, উহা বাঙ্গালার স্বাধীন সুলতান্‌গণের রাজত্বকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ ইহা হোসেন শাহ্ বা নসরৎ শাহ্ এতদুভয়ের রাজত্বকালে নির্ম্মিত বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

বঙ্গদেশের এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় দেখা যায় যে, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক ব্লকম্যান কর্ত্তৃক মঙ্গলকোট হইতে একটি শিলালিপি সংগৃহীত হইয়াছিল। ইহাতে লিখিত আছে যে, ৯৩০ হিজিরিতে মহম্মদ নসরৎ শাহের রাজত্বসময়ে মির্জ্জা মুয়জ্জম কর্ত্তৃক একটি মস্‌জিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

খোদিত লিপি

মঙ্গলকোটের প্রান্তস্থিত বড়বাজার বা নূতন হাটের মস্‌জিদের বিষয় পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। এই মস্‌জিদ্‌মধ্যে চন্দ্রসেন নামক জনৈক রাজার নামাঙ্কিত খোদিত লিপিযুক্ত কয়েকখণ্ড প্রস্তরফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে। মস্‌জিদের প্রত্যেক খিলানের পার্শ্বে যে দুইটি

স্তম্ভ আছে, তাহা ইষ্টকনির্ম্মিত, তবে যে স্থানে খিলানের ইষ্টক শেষ হইয়াছে, সেই স্থানে এক এক খণ্ড প্রস্তর সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই প্রস্তরগুলিতে স্থানে স্থানে খোদিত লিপি আছে। খোদিত লিপিগুলির অধিকাংশই অস্পষ্ট; অনুমান হয়, যে স্থানে মস্‌জিদ্‌টি নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই স্থানে পূর্ব্বে কোন দেবালয় ছিল, তাহারই খোদিত শিলাফলকখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া মস্‌জিদ্‌-নির্ম্মাণকালে ব্যবহার হইয়াছে। নূতন হাট বা বড়বাজারের মস্‌জিদ্‌টি একটি উচ্চ মৃৎপিণ্ডের উপরে নির্ম্মিত, চতুঃপার্শ্বস্থিত সমতল হইতে বিংশতি হস্ত উচ্চে ইহার ভিত্তি অবস্থিত। ইহার সম্মুখে ও দক্ষিণ পার্শ্বে অনেকগুলি উচ্চ মৃৎপিণ্ড ও বৃহৎ বৃহৎ দীর্ঘিকা আছে। তিন খণ্ড প্রস্তরের খোদিত লিপি এখনও পাঠ করা যায়ঃ—

(ক) ১। ... শ্রীচন্দ্রসেন নৃপ ত (?) রণ সেন্‌ • নাম্না

২। ... ... শ্রীি ... ...

বাঙ্গালার ইতিহাসে চন্দ্রসেন রাজার নাম নূতন। ইতিপূর্ব্বে কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থ বা খোদিত লিপি হইতে চন্দ্রসেনের নাম পাওয়া যায় নাই। নূতন হাটের মস্‌জিদের খোদিত লিপি হইতে তাঁহার অস্তিত্বমাত্র প্রমাণিত হইতেছে, তাঁহার বংশ-পরিচয় ও তারিখ সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার উপায় নাই। ভরতমল্লিক-প্রণীত "চন্দ্রপ্রভা" নামক বৈদ্যকুলগ্রন্থে চন্দ্রসেন নামক একজন রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়,—

"ধন্বন্তরিকুলে বীজী রাজা বিমলসেনকঃ।
তস্য বংশাবলী বক্ষ্যে সেনভূমিনিবাসিনঃ॥
একো বিমলসেনস্য পুত্রোঽভূৎ পরমেশ্বরঃ।
পরমেশ্বরতো জজ্ঞে বাসুদেবো গুণিপ্রিয়ঃ॥
চিকিৎসাকার্য্যনৈপুণ্যাৎ শিখরেশাশ্রয়ং গতঃ।
সম্মানপূর্ব্বকং তেন স্থাপিতোঽয়ং মহীভুজা॥
বাসুদেবস্য তনয়োঽনন্তসেন ইতি স্মৃতঃ।
উভাভ্যাং শস্ত্রশাস্ত্রাভ্যাং পণ্ডিতো রাজপূজিতঃ॥
তস্যৈবানন্তসেনস্য নাথসেনঃ সুতোঽজনি।
বাঙ্গকুমারসংসর্গাদস্ত্রবিদ্যাবিশারদঃ।
তস্যাস্ত্রবিদ্যামালোক্য প্রীতোঽভূৎ শিখরেশ্বরঃ।
হরিশ্চন্দ্রো দদৌ তস্মৈ তদ্দেশস্যৈকরাজতাম্‌॥
ততঃ পূর্ব্বার্জ্জিতং দেশং বিহায় খণ্ডসাধিতম্‌।
পাহাড়দেশখণ্ডে চ নাথসেনোঽভবন্নৃপঃ॥
তদীয়াঃ পূর্ব্বপুরুষাঃ রাজানস্তত্র চ স্থিতাঃ।
ইতি মত্বাভবদ্রাজা নাথসেনোঽতিযত্নতঃ॥

নৃপতের্নাথসেনস্য পুত্রো বিজয়সেনকঃ।
স এব সর্ব্বসংগ্রামে মহারাজোঽভবদ্বলী ॥
রাজ্ঞো বিজয়সেনস্য তনয়ৌ দ্বৌ বভূবতুঃ।
চন্দ্রবচ্চন্দ্রসেনোঽভূদ্‌বুধসেনো বুধোপমঃ ॥"

বাঙ্গালা বিশ্বকোষে তিন জন চন্দ্রসেনের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একজন হেমাচার্য্য সুরির শিষ্য, দ্বিতীয় অশ্বত্থমার হস্তে নিহত হন এবং তৃতীয় পরশুরামের সমসাময়িক।

খোদিত লিপির অক্ষরগুলি খৃষ্টীয় দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীর অক্ষরমালার অনুরূপ।

(খ) ১। ... গ ... স্তায়সঃ (?) f ... বাগ ... ... তে ম ...
২। ... সু ... ম্যাস্তিথৌ যাব
৩। শ্রী ... করকে ' ঠা

খোদিত লিপির এই অংশে তারিখ ছিল, প্রস্তরখণ্ডকর্ত্তনকালে তাহা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

(গ) ১। ... ষ্য নি ...
২। ... ষাং পমি ...
৩। চর্য্য সহি ...

(ঘ) ১। ... মণ্ডলপদ্ধতি ...
২। ... মায়াব (?) হেতুম ...

নূতন হাটের মস্‌জিদের সম্মুখে যে দীঘি আছে, তাহার অপর পার্শ্বে একটি দরগা আছে। এই দরগার সোপানে খোদিত লিপিযুক্ত একখণ্ড প্রস্তর আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

(ঙ) ১। ... দ আ
২। নী

মৌলানা হামিদ দানেশমন্দের সমাধির সম্মুখে বাঙ্গালার স্বাধীন সুলতান আলাউদ্দীন্ হোসেন সাহের রাজ্যকালে হিজরি ৯১৬ অব্দের খোদিত লিপির অনুবাদ;—

"ঈশ্বর বলিয়াছেন ... ... সৎ ...
মাননীয় আলাউদ্দুনিয়া ও অদ্দিন আবুল মজফ্‌ফর হুসেন শাহ সুলতান, হুসেনবংশীয় সৈয়দ আস্‌রফের পুত্র, ভগবান্ তাঁহার রাজত্ব ও গৌরব চিরস্থায়ী করুন। ৯১৬ সালে নির্ম্মিত হইল।"

মৌলানা হামিদ দানেশমন্দের সমাধির পার্শ্বে একটি পুরাতন মস্‌জিদের ভিত্তির উপরে মৌলবী মহম্মদ ইস্‌মাইলের যত্নে যে নূতন মস্‌জিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার দ্বারের উপরে পুরাতন মস্‌জিদের খোদিত লিপিটি গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছে।

খোদিত লিপির অনুবাদ,—

"ঈশ্বরের প্রেরিত (তাঁহার উপরে ঈশ্বরের অনুগ্রহ হউক) বলিয়াছেন—যে কেহ ঈশ্বরের নিমিত্ত কোনও মস্‌জিদ্ (উপাসনাস্থান) নির্ম্মাণ করিবে, ঈশ্বর তাহার জন্য স্বর্গে একটি গৃহ নির্ম্মাণ করিবেন। এই মস্‌জিদ্ দ্বিতীয় সাহেব করাণ সম্রাট্ সাহেব-উদ্দীন মহম্মদ শাহজহান

বাদশাহ গাজির রাজত্বকালে নির্ম্মিত হইয়াছে। যদি ইহার নির্ম্মাণের তারিখ তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহা হইলে উহাকে বয়তুল আতিক বলিবে বলিয়া সম্বোধন করিবে, হিঃ ১০৬১।"

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, পুরাতন মস্‌জিদটি ১০৬১ হিজরি অর্থাৎ ১৬৫৪-৫৫ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। স্বর্গীয় ডাক্তার এইচ্ ব্লকম্যান মঙ্গলকোটে আর একখানি খোদিত লিপি আবিষ্কার করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।* আমরা অনেক সন্ধান করিয়াও এই খোদিত লিপির সন্ধান পাই নাই।

খোদিত লিপির অনুবাদ,—

ঈশ্বরের প্রেরিত (তিনি ঈশ্বরের অনুগ্রহভাজন হউন) বলিয়াছেন,—যে কেহ ঈশ্বরের নিমিত্ত কোনও মস্‌জিদ্ (উপাসনাস্থান) নির্ম্মাণ করিবে, ঈশ্বর তাহার নিমিত্ত সেই প্রকারের একটি গৃহ স্বর্গে নির্ম্মাণ করিবেন। এই জামেমস্‌জিদ্ হুসেনসাহের পুত্র প্রশংসিত সুলতান্, সুলতানের পুত্র সুলতান্ নাসের উদ্দ্‌ুনিয়া ও অদ্দিন আবুল মজফ্‌ফর নসরৎ শাহের রাজত্ব-কালে নির্ম্মিত। ঈশ্বর তাঁহার রাজত্ব ও প্রাধান্য চিরস্থায়ী করুন। ইহার নিম্মাণকারী খান্ মিয়া মুয়জ্জম, মোরাদ হায়দর খানের পুত্র, তাঁহার সম্ভ্রম বৃদ্ধি হউক, নয় শত ত্রিশ সালে নির্ম্মিত।"

বন্ধুবর মৌলবী শ্রীযুক্ত আবুল মজফ্‌ফর জমালুদ্দিন মহম্মদ অনুগ্রহ করিয়া আরবীতে খোদিত লিপিগুলির অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়,
শ্রীহরিদাস পালিত,
শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু।

* J. A. S. B. 1896. Pt. I. P. 296.

শূরনগর

রাঢ়দেশে (বর্ত্তমান বর্দ্ধমান জেলার মন্তেশ্বর থানার অধীন "শূউরো" গ্রামে) ভাগীরথী-তীর সন্নিকটে "শূরনগর" নামে একটী সমৃদ্ধিশালী নগরে আদিশূরের এক রাজধানী ছিল। স্থানীয় জনপ্রবাদ ও বর্ত্তমান কালে উক্ত শূরনগরের ধ্বংসাবশেষ এখনও সেই গত স্মৃতি উজ্জ্বল রাখিয়াছে। এই শূরনগর দৈর্ঘ্যে প্রায় আট মাইল এবং প্রস্থে ৪।৫ মাইল বিস্তৃত ছিল।

এক্ষণে ধ্বংসাবশিষ্ট শূরনগরের ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র পল্লীতে পরিণত হইয়াছে। শূরনগরের যে স্থানে আদিশূরের রাজপ্রাসাদ ছিল, সেই স্থানটী এক্ষণে শূরো বা শূউরো নামে, যে স্থানে ধনাগার ছিল তাহা গড় সোণাডাঙ্গা নামে, যে স্থানে কারাগৃহ বা ভাটের বাস ছিল, তাহা বোঁদপুর (বন্দীপুর) নামে, সে স্থানে নগরের প্রধান প্রবেশদ্বার ছিল তাহা দ্বারী: বা দুয়ারি নামে, যে স্থানে কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণ বংশধরগণকে সঙ্গে আনিয়া প্রথম অবস্থান করাইয়াছিলেন, তাহা ব্রহ্মপুর নামে, এইরূপে কান্যকুব্জাগত ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীহর্ষপুত্র বরাহ রাইগ্রাম নামক যে গ্রামখানি পাইয়াছিলেন, তাহা এখনও রাইগ্রাম নামে পরিচিত। (এই রাইগ্রামেই আদিশূরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী৺বরাহগোপাল দেবের অতুলনীয় মন্দির ছিল।) এতদ্ব্যতীত শূরনগরের সীমার মধ্যে হাজরাপুর ও মথুরা নামক দুইখানি গ্রাম আছে এবং রাউৎগ্রাম নামক একখানি গ্রামে আদিশূরের শ্রীশ্রী৺সর্ব্বমঙ্গলা দেবী আছেন। গোকর্ণ গোহালবাটী বা গোরু থাকিবার স্থান এবং মনোহরগঞ্জে বাজার* ছিল। ভাতশালা গ্রামে অতিথিশালা ছিল। এই শূউরো গ্রামে আদিশূরের রাজপ্রাসাদের ভিত্তিচিহ্ন, প্রাসাদ-অভ্যন্তরস্থিত কয়েকটী কূপ এবং শ্রীশ্রী৺হনুমানজী দেবের ভগ্ন শ্রীবিগ্রহ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। গড়-সোণাডাঙ্গায় একটী গড়ের চিহ্ন আছে। শূউরো হইতে এক মাইল দূরে "শালিটা" ও "শালকোন" দীঘি অদ্যাপি রাজা আদিশূরের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। দীঘি দুইটী এত বৃহৎ যে, লোকে তাহাদিগকে "বিল" বলিয়া থাকে। শালিটা দীঘির চারিদিকের পাহাড় এখনও রীতিমত বাঁধা আছে। এক স্থানে একটী বাঁধা ঘাটের চিহ্নও দেখা যায়। এই প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা খননকালে খননকারী মজুরগণ (কোঁড়ারা) যে স্থানে বাস করিয়াছিল তাহা অদ্যাপি "কোঁড়াপুর" নামে পরিচিত। সম্প্রতি কাঁটোয়ার উত্তর সীতাহাটী ও নৈহাটির নিকট প্রাপ্ত বল্লালসেনের তাম্রশাসন† পাঠে

---

* এই মনোহরগঞ্জ ও গোহালবাটীতে পরে দিল্লীর বাদশাহের মুন্সি ৺অভিরামবসু বাসভবন ও গোহাল-বাটী করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে তিনি ব্রহ্মপুরে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার বংশধর মুন্সি মহাশয়েরা এখনও এই ব্রহ্মপুরে বাস করিতেছেন।

† সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৭শ ভাগ ৪র্থ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অবগত হওয়া যায় যে, মহারাজ "সামন্তসেনের" পূর্ব্বে সেনবংশের রাজপুত্রগণ অপ্রতিহত প্রভাবে রাঢ়দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। (তাম্রশাসনের ১ম পৃষ্ঠা ৫-৬ পংক্তি দ্রষ্টব্য।)

অনুমান হয় যে, সেনবংশের রাজারা যখন নবদ্বীপ* অঞ্চলে রাজধানী করেন, সেই সময় হইতেই শূরনগরের অবস্থা মলিন হইতে আরম্ভ হয় এবং কালপ্রভাবে সেই সমৃদ্ধিশালী নগর কয়েকখানি ক্ষুদ্র পল্লীতে পরিণত হইয়াছে। কেবল যে রাঢ় দেশের এই নগরের অবস্থা এইরূপ শোচনীয় হইয়াছে, তাহা নহে। এই শূরনগরের উত্তর-পশ্চিমে কাঁটোয়ার নিকটস্থিত "ইন্দ্রাণী" নামে যে মহানগরী ছিল, তাহা এক্ষণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে পরিণত হইয়াছে। "বার-হাট তের ঘাট তিন চণ্ডী তিন শ্বরের (অনাদিলিঙ্গ শিব)" মধ্যে দুই একটী লুপ্ত হইয়া বাকি সমস্তগুলি এখনও রহিয়াছে এবং কয়েকখানি ভগ্ন প্রস্তর-ইন্দ্রাণীর অতীত গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কবিবর ৺কাশীরাম দাস মহাভারতে এবং কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চণ্ডী-কাব্যের মধ্যে ইন্দ্রাণীর উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যভাগবত-রচয়িতা শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

"ইন্দ্রাণী নিকটে কাঁটোয়া নামে গ্রাম।"

দেখুন ৪০০ শত বৎসর পূর্ব্বে যে ইন্দ্রাণীর সহিত তুলনায় কাঁটোয়া একখানি সামান্য গ্রাম মাত্র, আজ কালপ্রভাবে তাহার কিরূপ শোচনীয় অবস্থা। অপেক্ষাকৃত আধুনিক ইন্দ্রাণীর যখন এরূপ অবস্থা, তখন ১০০০ বৎসর পূর্ব্বের শূরনগরের অবস্থা যে তাহা অপেক্ষাও অধিকতর শোচনীয় হইবে, তাঁহার আর বিচিত্র কি!

পূর্ব্বোল্লিখিত রাইগ্রামের আদিশূর রাজার শ্রীশ্রী৺বরাহগোপালদেবের যে ধ্বংসাবশিষ্ট শ্রীমন্দির আছে, আমি তথায় গত (১৩১৮ সাল) ৯ই শ্রাবণ গমন করিয়াছিলাম, দেখিলাম শূররাজপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণসমাজ "রাইগ্রামে" এক্ষণে হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যা অল্প, তথায় এখন মুসলমানগণই প্রবল। যে স্থানে শ্রীমন্দিরটী ছিল, তাহা সমতলভূমি হইতে ১০।১২ হাত উচ্চ। মন্দিরটী প্রকাণ্ড ছিল, কারণ তিন একার পরিমিত স্থানের উপর অবস্থিত। এক্ষণে সেই উচ্চ ভূখণ্ডের উপর রাশিকৃত ইষ্টক-স্তূপ এবং চারিটী বড় বড় প্রস্তরস্তম্ভ পতিত আছে, তাহার মধ্যে দুইটী থামের দৈর্ঘ্য ৮½ ফিট্ এবং বেড় ৬ ফিট্, অপর দুইটীর দৈর্ঘ্য ৫ ফিট্ এবং বেড় ৬ ফিট্। প্রবাদ আছে বঙ্গবিজয়ের পর কতকগুলি মুসলমান রাইগ্রামের প্রান্ত-বাহিনী একটী ক্ষুদ্র নদী† দিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে নৌকাযোগে গমন করিতেছিলেন এবং আদিশূরের শ্রীশ্রী৺বরাহগোপালের মন্দিরের শীর্ষদেশে স্থাপিত একখানি কাচ বা কোন জ্যোতির্ম্ময় প্রস্তরে অস্তাচলচূড়াবলম্বী সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত দেখিয়া পূর্ব্বদিকে প্রতিফলিত সূর্য্যরশ্মিকে সূর্য্য মনে করিয়া নদীতীরে অবতরণপূর্ব্বক পশ্চিমদিক্ ভ্রমে পূর্ব্বাভিমুখে "নমাজ"

---

* এই বিষয়ে বিশেষ আলোচনা আবশ্যক।

† এক্ষণে এই নদীটী মজিয়া গিয়াছে, তবে স্থানে স্থানে চিহ্ন মাত্র আছে।

করেন এবং পরে তাঁহারা তাঁহাদিগের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া ভবিষ্যতে অন্য কোন মুসলমান যাহাতে সেইরূপ ভ্রমে পতিত না হয়, তজ্জন্য মন্দিরটী ধ্বংস করিয়া ফেলেন এবং মন্দিরশীর্ষে সংলগ্ন উক্ত ভানুপ্রভ প্রস্তরখানি লইয়া যান। মুসলমানগণ মন্দির ধ্বংস করিবার উদ্যোগ করিলে ৺বরাহগোপালদেবের সেবাইত ব্রাহ্মণ গোপনে কোনরূপে শ্রীবিগ্রহটী লইয়া রাই-গ্রামের এক ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত কাইগ্রামে পলায়ন করেন। সেই ব্রাহ্মণের বংশধরগণ আজ পর্য্যন্ত কাইগ্রামে সেই দেবসেবা করিতেছেন।

এই রাইগ্রাম এক্ষণে বর্দ্ধমান জেলায় মুর্শিদাবাদের খ্যাতনামা উকীল শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন বরাট মহাশয়ের জমিদারীর অন্তর্ভূ‌ত। কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয় এই যে, সম্প্রতি এই দেবমন্দিরের পবিত্র ধ্বংসাবশেষের উপর মুসলমানেরা তাহাদের মৃতদেহ কবর দিতে আরম্ভ করিয়াছে। আশা করি, বৈকুণ্ঠবাবু স্থানীয় অতীত কীর্ত্তি উদ্ধারকল্পে মনোযোগী হইবেন।

রাইগ্রামনিবাসী মুসলমানদের নিকট এই মন্দিরের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তাঁহারা বলেন, আমরা বংশানুক্রমে শুনিয়া আসিতেছি যে, "উহা আওউল রাজার গোপাল-মন্দির।" ("আউল" অর্থে আদি বা প্রথম।)

এই রাইগ্রামে এক্ষণে পীর গোঁরাচাদ সাহেবের একটী প্রকাণ্ড সমাধিমন্দির আছে। কথিত আছে, আদিশূরের ভগ্ন মন্দিরের অনেক উপাদান দ্বারা এই সমাধিমন্দির আকবরের রাজত্বকালে নির্ম্মিত হইয়াছে। এই মন্দিরের দ্বারের উপরিভাগে স্থাপিত একখানি প্রস্তরফলকে পার্শি ভাষায় কিছু লিখিত আছে। উপযুক্ত মৌলবীর অভাবে পাঠোদ্ধার করাইতে পারি নাই। পূর্ব্বে যে স্থানে শূরনগর ছিল, তাহার মধ্য দিয়া এক্ষণে "খড়ী" বা "খড়্গেশ্বরী" নামে একটী ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত হইয়াছে। পূর্ব্বে এই নদী ছিল না। রাইগ্রামের প্রান্তবাহিনী নদী এবং বেহুলা নদী মজিয়া যাওয়ায়, আনুমানিক ৪০০।৫০০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে মানকর-মাড়ো হইতে প্রবাহিত একটী ক্ষুদ্র জলস্রোত এই খড়্গেশ্বরী বা খড়ী নদীতে পরিণত হইয়াছে।

শ্রীঅম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী।



১। কাঁটোয়া—গৌরাঙ্গবাড়ীর সম্মুখ

Printed by
K. V. SEYNE & Bros.



২। মহাপ্রভুর দীক্ষাস্থান (কেশব ভারতী ও মহাপ্রভুর আসন)



৬। কাটোয়া—গদাধর দাস প্রতিষ্ঠিত গৌরাঙ্গদেব

স্থান-পরিচয়

কাঁটোয়া

কাঁটোয়া বর্দ্ধমান জেলার মধ্যে একটী অতি প্রাচীন বন্দর। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক আরিয়ানের গ্রন্থে কাঁটাদীয়া বা কণ্টকদ্বীপের অপভ্রংশে 'কাঁটাতুপা' (Katadupa) নামে এই স্থান পরিচিত হইয়াছে। গঙ্গা ও অজয়-নদের সঙ্গমে অবস্থিত বলিয়া পূর্ব্বকালে দূরদেশ হইতে সমুদ্রপোত বাণিজ্য-সম্ভার লইয়া এখানে আগমন করিত। যদিও এখানে এখনও জেলার মহকুমা থাকায় এই স্থান এককালে শ্রীহীন হয় নাই, কিন্তু পূর্ব্বকালের তুলনায় প্রাচীন সমৃদ্ধির কিছুই নাই। পূর্ব্বতন কীর্ত্তিরাশির অধিকাংশই গঙ্গা ও অজয়ের গর্ভশায়ী। পূর্ব্বে এই স্থান 'কাঁটাদীয়া' নামে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের একটী প্রধান সমাজ বলিয়া গণ্য ছিল। মুসলমান-বিপ্লবে সেই সমাজ ভঙ্গ হয়। এই স্থানের সমৃদ্ধি ও অবস্থান লক্ষ্য করিয়া নদীয়া-বিজয়ের পরই মুসলমানেরা এখানে আসিয়া কেন্দ্র স্থাপন করেন। তজ্জন্য ধর্ম্মপ্রাণ ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের ব্যক্তিগণ এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া অনেকে পূর্ব্ববঙ্গ আশ্রয় করেন। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের অভ্যুদয়কালে এই স্থানে বহু সাধু-সন্ন্যাসী ও ভক্তগণের আশ্রম ছিল। মহাপ্রভু এই কাঁটোয়ায় আসিয়া কেশব ভারতীর নিকট দীক্ষিত হন। তাহার স্মৃতি লইয়া বর্ত্তমান কাঁটোয়া সহরে 'মহাপ্রভু গৌরাঙ্গের বাড়ী' বলিয়া একটী বৃহৎ দেবালয় নির্ম্মিত হইয়াছে। (১ চিত্র দ্রষ্টব্য) এই মন্দিরটী বেশীদিনের প্রাচীন না হইলেও তন্মধ্যে অনেক প্রাচীন স্মৃতি এখনও বিদ্যমান। এই গৌরাঙ্গ বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই পশ্চিমদিকে মহাপ্রভুর মস্তকমুণ্ডনের স্থান। এখানে অনেক বৈষ্ণব ভক্ত আসিয়া মাথা মুড়াইয়া কেশ দিয়া যান। এই মুণ্ডন-স্থানের পূর্ব্বদিকে মহাপ্রভুর কেশ-সমাধি ও গদাধর দাসের সমাধি রহিয়াছে। গদাধর দাস জাতিতে কায়স্থ, বাটী আঁড়িয়াদহ। তিনি চৌষট্টি মোহন্তের মধ্যে একজন। ভক্তিরত্নাকরে তাঁহার পরিচয় আছে। তিনিই এখানকার গৌরাঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। গদাধর দাসের সমাধি ছাড়াইয়া বামদিকে ঘেরা প্রাচীর মধ্যে কেশব ভারতীর সাধনা ও সিদ্ধি-স্থান। তথায় মহাপ্রভুর দীক্ষার আসন, গুরু-শিষ্যের পদচিহ্ন ও তাহার সম্মুখে মধু নাপিতের সমাধি আছে। (২ চিত্র দ্রষ্টব্য) দীক্ষা-স্থানের পশ্চিমে এখানকার গৌরাঙ্গ বিগ্রহের সেবাইত বেণীমাধব ঠাকুরের সমাধি। তৎপরে বাড়ীর ভিতর ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ মধ্যে গদাধর দাস-প্রতিষ্ঠিত মহাপ্রভুর মূর্ত্তি। (৩ চিত্র দ্রষ্টব্য) তাঁহার পার্শ্বে পরবর্ত্তী কালে প্রতিষ্ঠিত নিত্যানন্দের মূর্ত্তি আছেন। মহাপ্রভুর প্রাচীন মন্দির ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় গত ১২৮৮ সালে সেই প্রাচীন মন্দিরের সংস্কার হইয়াছে। ইহার সম্মুখে নাটমন্দির ও পার্শ্বে ভোগমন্দির। গদাধর দাস তাঁহার প্রিয় শিষ্য যদুনন্দন ঠাকুরকে গৌরাঙ্গের সেবার ভার দিয়া যান। এই যদুনন্দন ঠাকুরই প্রেমবিলাস, কর্ণানন্দ প্রভৃতি বৈষ্ণব-গ্রন্থরচয়িতা। যদুনন্দন ঠাকুরের বংশধর রাঢ়ীয় শ্রেণির ব্রাহ্মণগণই এখানকার

সেবাইত। ভেট দ্বারা মহাপ্রভুর সেবা চলে, কোন দেবোত্তর নাই। গৌরাঙ্গ-বাড়ী ছাড়াইয়া কিছু দূর গেলে গঙ্গা-অজয়-সঙ্গম। এই সঙ্গম ছাড়াইয়া কিছু দূর আসিয়া গৌরাঙ্গ-ঘাট, এখন সেই প্রাচীন স্থান গঙ্গা-গর্ভে। এই খানেই কেশব ভারতীর আশ্রম ছিল। এই স্থান ছাড়াইয়া প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূরে মাধাই-তলা।

কাঁটোয়া সহর মধ্যে বড়-প্রভুর আখড়া, ফরুখ্‌শিয়ারের মস্‌জিদ ও গড়খাই,* পলাশী যাইবার সময় ক্লাইব যেখানে শিবির করিয়াছিলেন, সেই স্থান এবং কেরি সাহেবের কুঠী—এই গুলি দেখিবার জিনিস।

দাঁইহাট

কাঁটোয়া সহরের সাড়ে চারি মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে দাঁইহাট। এক সময় কাঁটোয়া হইতে দাঁইহাট পর্য্যন্ত একটী বৃহৎ সংলগ্ন সহর ছিল ও লক্ষাধিক লোকের বাস ছিল। অদ্যাপি সেই প্রাচীন সমৃদ্ধির ক্ষীণ স্মৃতি বর্ত্তমান দাঁইহাট হইতে কাঁটোয়া পর্য্যন্ত বিদ্যমান। এক সময় যে এই স্থান মধ্যে কত হাট, কত মন্দির, কত ঘাট ছিল, অদ্যাপি সেই সমুদায়ের ধ্বংসাবশেষ প্রাচীন গঙ্গাগর্ভের অদূরে কাঁটোয়া হইতে দাঁইহাট যাইবার রাস্তার ধারে পড়িয়া রহিয়াছে। এক সময় এই স্থানেই ইন্দ্রাণী পরগণার কেন্দ্র ছিল। তিন শত বর্ষ পূর্ব্বে কবি কাশীরাম এই ইন্দ্রাণীকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন,—

"ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্ব্বাপর স্থিতি।
দ্বাদশ তীর্থেতে যথা বৈসে ভাগীরথী॥"

এই দ্বাদশ তীর্থের মধ্যে অধিকাংশ কাঁটোয়া হইতে দাঁইহাট আসিবার রাস্তার ধারে অবস্থিত ছিল, এখন সেই তীর্থের ঘাট বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে, গঙ্গা তাহার এক মাইলেরও দূরে সরিয়া গিয়াছেন। কাঁটোয়া হইতে আসিবার সময় ঘোষহাটে ঘোষেশ্বর, পাতাই-হাটে পাতাই-চণ্ডী ও একাই-হাটে একাই-চণ্ডী প্রথমে নয়নগোচর হয়। ইন্দ্রাণী পরগণার রাজা ইন্দ্রেশ্বর গঙ্গাতটে যে সুবৃহৎ শিব-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, মুসলমান-হস্তে তাহা বিধ্বস্ত হইয়াছে। যেখানে সেই শিব-মন্দির বা রাজবাটী ছিল, সেই স্থান আজও "রাজার ডাঙ্গা" নামে পরিচিত। তাহার নিকটে একটি মস্‌জিদ রহিয়াছে। এই মস্‌জিদের সম্মুখে ইন্দ্রেশ্বরের দ্বারের চৌকাটের মাথার প্রস্তরখণ্ড পড়িয়া আছে। এই সুচিক্কণ কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর-খণ্ড দৈর্ঘ্যে ৭ ফুট ৮ ইঞ্চ ও প্রস্থে দেড় ফুট, ইহার মধ্য ভাগে এক দ্বিভুজ গণেশ মূর্ত্তি। (৪ চিত্র দ্রষ্টব্য) এই সুন্দর ও বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, ইন্দ্রেশ্বরের প্রস্তর-মন্দির কত বৃহৎ ও কিরূপ সুন্দর ছিল! উক্ত মস্‌জিদের ভিত্তি ও প্রাঙ্গণে এখনও পূর্ব্বতন

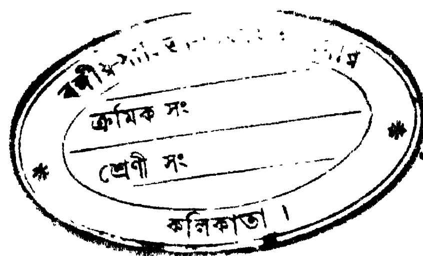
---

* গেজেটিয়ারে উক্ত গড় ও মস্‌জিদ মুর্শিদকুলী খাঁর (ওরফে জাফর খাঁর) কীর্ত্তি বলিয়া ধরা আছে। (Burdwan District Gazetteer, 1910, p. 200) কিন্তু কাঁটোয়াবাসী ইহাকে ফরুখ্‌শিয়ারের কীর্ত্তি বলিয়াই জানে।

৪। ইন্দ্রেশ্বরের দ্বারের মাথার অংশ



৫। দাঁইহাটের নিকটবর্ত্তী সিদ্ধেশ্বরীর ভগ্ন মন্দির ও রামানন্দের সিদ্ধিস্থান



প্রাচীন মন্দিরের নিদর্শন-স্বরূপ কত কাটা-পাথর রহিয়াছে, তাহা দেখিলেই ইন্দ্রেশ্বরের অতীত গৌরবের কতকটা সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে। ঐ স্থানের পার্শ্ব দিয়া যে ভাগীরথী বহিতেন—এখন তিনি প্রায় এক মাইলেরও বেশী দূরে সরিয়া গিয়াছেন। মস্‌জিদ হইতে ১ মাইল উত্তর-পশ্চিমে জনসাধারণে 'ইন্দ্রেশ্বরের ঘাট' দেখাইয়া থাকেন। এখানে প্রাচীন ইষ্টক-স্তূপ রহিয়াছে। আজও কেবল ইন্দ্রদ্বাদশীর দিন ইন্দ্রেশ্বরের ঘাটে বহু যাত্রী স্নান করিতে আসেন। মস্‌জিদ, তাহার নিকটস্থ 'রাজার ডাঙ্গা' এবং 'ইন্দ্রেশ্বরের ঘাট' পুরাবিদ্‌গণের অনুসন্ধেয় প্রাচীন স্থান।

ইন্দ্রেশ্বরের ঘাটের নিকট সিদ্ধেশ্বরী-তলার মধ্যে রামানন্দের পাট। (৫ চিত্র দ্রষ্টব্য) সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরের উত্তরে রামানন্দ সিদ্ধি লাভ করেন। এখানে তাঁহার পঞ্চমুণ্ডী আসন আছে। এই রামানন্দই "শ্যামা দিগম্বরি রণমাঝে নাচো গো মা!" ইত্যাদি প্রসিদ্ধ গান-রচয়িতা। মন্দিরের পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে "কেশেগ'ড়ে"। এখানকার কেহ কেহ এই কেশেগ'ড়কে কাশীরাম দাসের স্মৃতি-জ্ঞাপক মনে করেন, কিন্তু কাশীরামের জন্মস্থান সিঙ্গি গ্রাম এই স্থান হইতে বহু দূর।

বর্ত্তমান দাঁইহাটের উত্তরাংশে দেওয়ানগঞ্জ। পূর্ব্বে এখানে বহুলোকের বসতি ও একটী বৃহৎ হাট ছিল। এখনও এখানে অনেক বড় বড় ভাঙ্গা বাড়ী পড়িয়া আছে। হাটও দাঁইহাট গ্রামের মধ্যে উঠিয়া গিয়াছে। গঙ্গাও এখান হইতে ১ মাইলের উপর সরিয়া গিয়াছেন, কিন্তু দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে এই দেওয়ানগঞ্জের হাটের পার্শ্ব দিয়া গঙ্গা বহিতেন এবং এই স্থানে বহুলোকের বাস ও যথেষ্ট জাঁকজমক ছিল। বিজয়রাম বিশারদের তীর্থমঙ্গল-গ্রন্থ হইতে তাহার বেশ পরিচয় পাইয়াছি। সে সময়ে এখানে 'মাণিকচাঁদের ঘাট' প্রসিদ্ধ ছিল।* এখানকার স্থানীয় লোকের মুখে শুনা যায় যে, এখানে 'পাতালঘর' আছে। পূর্ব্বে বড় বড় পাথরের মন্দির ছিল, তাহারই কতক অংশ লইয়া বর্ত্তমান 'বদরশার কবর' প্রস্তুত হইয়াছে। এই দরগার সম্মুখ-দ্বারে প্রাচীন দেবমন্দিরের শিল্পনৈপুণ্যযুক্ত প্রস্তর বিদ্যমান, তাহা দেখিলেই প্রাচীন হিন্দু মন্দিরেরই নিদর্শন বলিয়া বোধ হয়। একটী বৃহৎ স্তূপের উপর বদরশার দরগা উঠিয়াছে। ইহার নিকট এখনও বহু পুরাতন কাটা-পাথর পড়িয়া আছে। ঐ দরগার সেবাইত আমায় জানাইলেন যে, বর্দ্ধমানরাজের দেওয়ান মাণিকচাঁদ বদরশাহ আউলিয়াকে এই স্থান দান করেন। সুতরাং যে সময়ে দেওয়ান মাণিকচাঁদ ছাড় দেন, তাহারও বহু পূর্ব্ব হইতেই হিন্দুর এই দেবস্থান ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। দেওয়ান মাণিকচাঁদ হইতেই 'দেওয়ানগঞ্জ' নাম হইয়াছে।

দাঁইহাটের পূর্ব্ব গৌরবের শেষ চিহ্ন ভাস্করবংশ এখনও বিদ্যমান। ভাস্কর শিল্পনৈপুণ্যে এখানকার ভাস্করবংশ বহুদিন হইতে প্রসিদ্ধ। দাঁইহাটের পার্শ্বে জগদানন্দপুরে উত্তররাঢ়ীয়

* তীর্থমঙ্গল ১০১১ শ্লোক (সাহিত্য-পরিষৎ-সংস্করণ)

ঘোষচৌধুরীবংশের প্রতিষ্ঠিত একটী বৃহৎ রাধাগোবিন্দের মন্দির আছে। কাশী, মৃজ্জাপুর প্রভৃতি স্থান হইতে নানা বর্ণের পাথর আনাইয়া তদ্দ্বারা এই সুন্দর মন্দিরটী নির্ম্মিত হইয়াছে। এরূপ ভাস্কর্য্য ও শিল্পনৈপুণ্যযুক্ত চমৎকার বৈষ্ণব-মন্দির রাঢ়দেশে বিরল। (৬ চিত্র দ্রষ্টব্য) কএকটী প্রাচীন নিদর্শন ব্যতীত দাঁইহাটের পাইকপাড়ার পার্শ্বে জঙ্গল শাহের গড়ের চিহ্ন এবং প্রাচীন গঙ্গা-গর্ভের অদূরে বর্দ্ধমানরাজের সমাজবাড়ী বিদ্যমান। (৭ চিত্র দ্রষ্টব্য) বর্ত্তমান বর্দ্ধমান-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আবুরায় হইতে মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র পর্য্যন্ত বর্দ্ধমানাধিপগণের ঐ সমাজ-বাড়ী মধ্যে অস্থিসমাধি আছে।

পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে, গঙ্গা দাঁইহাট হইতে সরিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু গত বর্ষ হইতে গঙ্গা-প্রবাহ ধীর মন্থর গতিতে আবার যেন পূর্ব্ব গর্ভে ফিরিয়া আসিতেছেন।

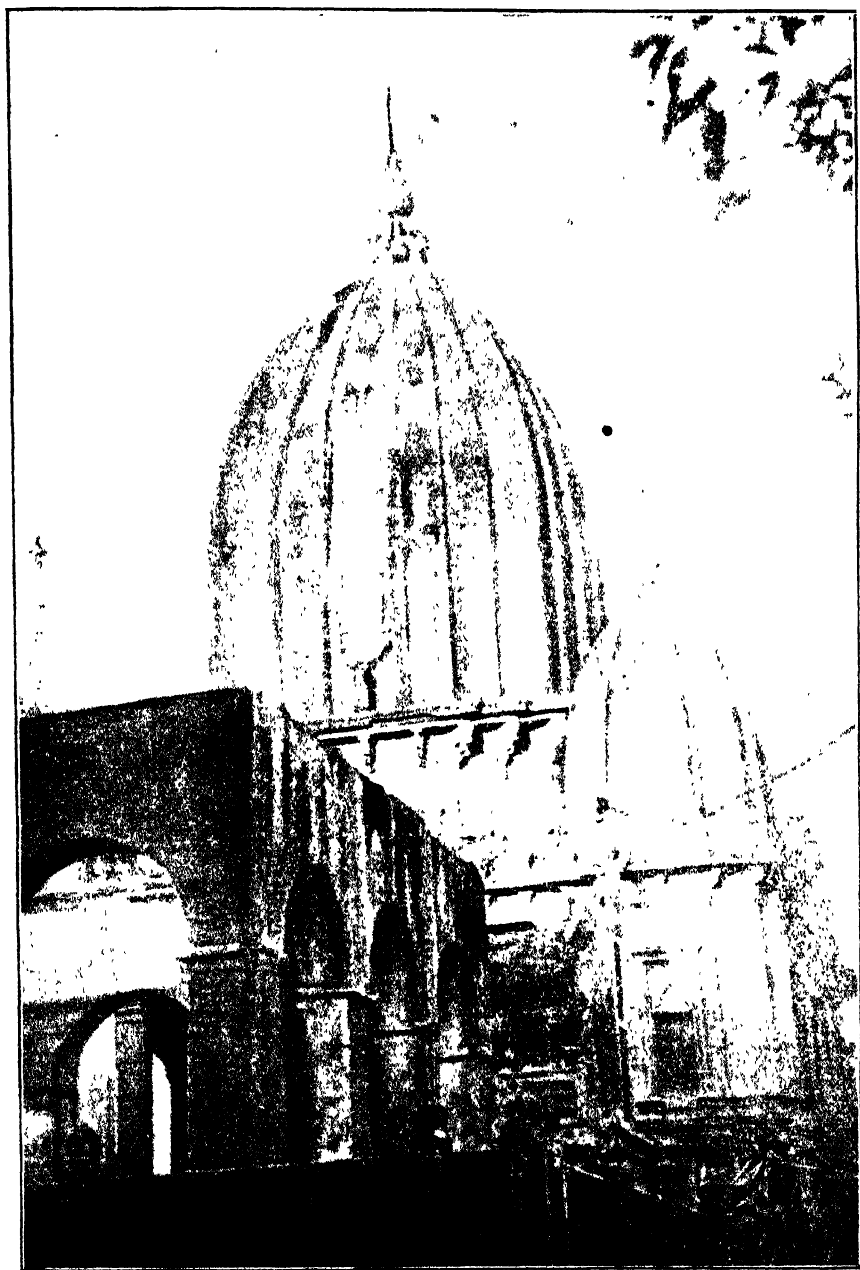
বিল্বেশ্বর ও কুলাই

কাঁটোয়া সহর হইতে ৫ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে অজয়ের তীরে প্রাচীন কুলাই গ্রাম। কাঁটোয়া হইতে ২॥০ ক্রোশ দূরে কুলাই যাইবার পথে বিল্বেশ্বর। তন্ত্রচূড়ামণি ও শিবচরিতে দেখা যায়—অট্টহাসে যে ফুল্লরা শক্তি আছেন, বিল্বেশ্বর বা বিল্বনাথ তাঁহারই ভৈরব। বিল্বেশ্বরের প্রাচীন মন্দির নষ্ট হওয়ায় বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানে শিবরাত্র ও চড়ক-সংক্রান্তির সময় বহু জনতা হয়। এই বিল্বেশ্বর হইতে প্রায় আড়াই ক্রোশ দূরে কুলাই। প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা মহাপ্রভুর পার্ষদ বাসুদেবঘোষ ঠাকুরের জন্মস্থান বলিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে এই স্থান প্রসিদ্ধ। ঘোষঠাকুরের পিতামহ গোপাল ঘোষ ফতেসিংহ পরগণাস্থ রসোড়া হইতে এখানে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার পুত্র বল্লভ ঘোষ বাইশটী করণ করিয়া উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

"রসোড়া ছাড়িয়া গোপাল কুলায়ে বসতি।
বাইশ বল্লভঘোষ নাম হইল খ্যাতি॥" (কুলপঞ্জী)

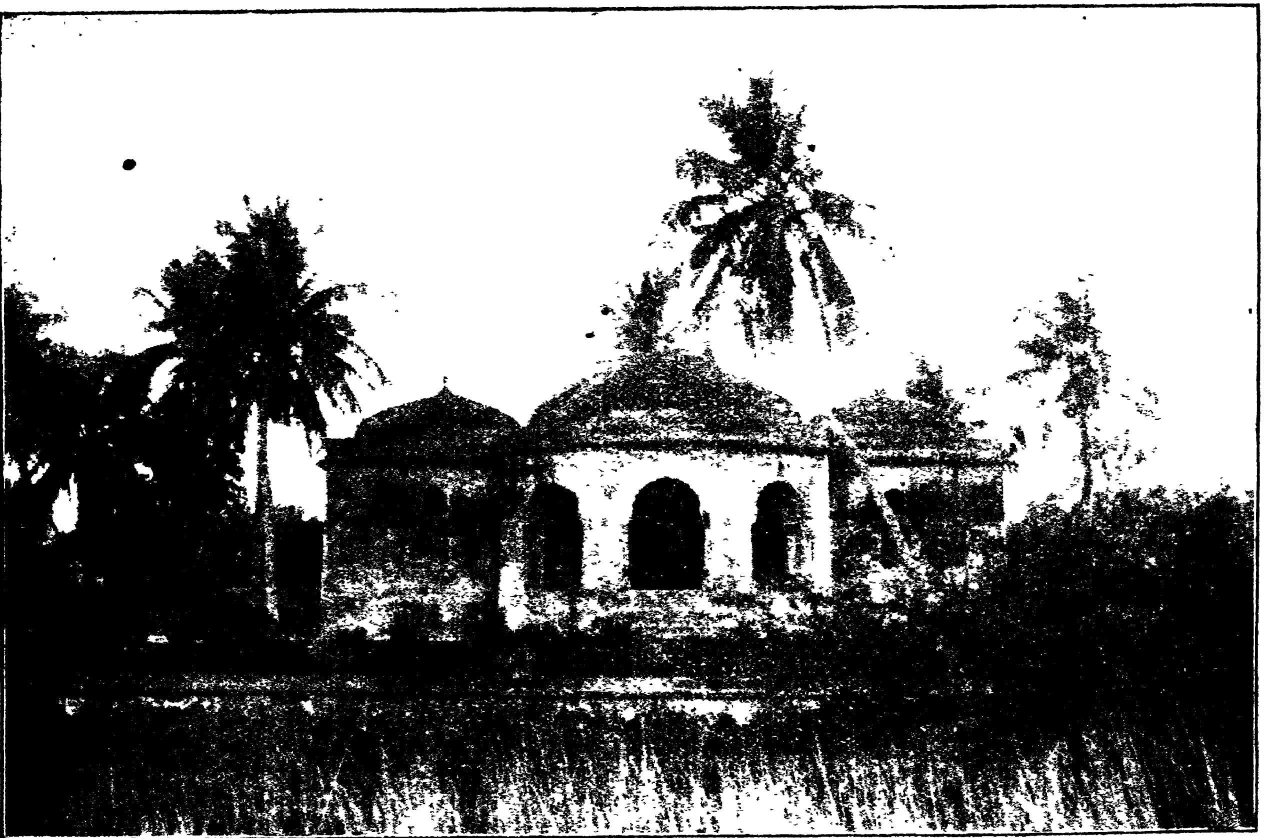
এই বল্লভঘোষের ৯ পুত্র—১ম পক্ষে বাসুদেব, গোবিন্দ ও মাধব, ২য় পক্ষে দনুজারি, কংসারি ও মীনকেতন এবং ৩য় পক্ষে জগন্নাথ, দামোদর ও মুকুন্দ। ইঁহারা সকলেই মহাপ্রভুর একান্ত ভক্ত ছিলেন। প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা বাসুদেব ঘোষ, মাধব ঘোষ ও গোবিন্দ ঘোষ চৈতন্যদেবের অনুবর্ত্তী হইয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। এই গোবিন্দ ঘোষই অগ্রদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ গোপীনাথ-বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা। অগ্রদ্বীপ-প্রসঙ্গে তাঁহার কিছু পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। কংসারি ঘোষের সন্তানেরা অদ্যাপি কুলাই গ্রামে বাস করিতেছেন। এই ঘোষবংশেই দিনাজপুরের মহারাজ সর্ গিরিজানাথ রায় বাহাদুর এবং রায় রাধাগোবিন্দ রায় সাহেব বাহাদুর জন্মলাভ করিয়াছেন।

কুলাই গ্রামে অজয়ের তীরে গৌরাঙ্গের বিশ্রামস্থান ও উহার এক পোয়া উত্তরে গ্রামের মধ্যে বাসুদেব ঘোষঠাকুরের সাধনার স্থান এবং বাসুদেব, গোবিন্দ, মাধব প্রভৃতির বাসচিহ্ন



৬। জগদানন্দপুর—রাধাগোবিন্দের প্রস্তরমন্দির

SEYNE PRESS.



৭। দাইহাট—বর্দ্ধমানরাজের সমাজবাড়া

আছে। এখানে বাসুদেবঘোষ যে নিম্ববৃক্ষতলে বসিয়া সাধনা করিতেন, সেই নিম্ববৃক্ষ লইয়া গিয়াই মহাপ্রভুর বিগ্রহ মূর্ত্তি প্রস্তুত হয়। কাহারও মতে সেই বিগ্রহ কাঁটোয়ায়, কাহারও মতে শ্রীখণ্ডে বর্ত্তমান।

কেতুগ্রাম

(বহুলাপুর)

কুলাই হইতে দেড় ক্রোশ দূরে কেতুগ্রাম। কেতুগ্রামের পটী বহুলাপুরে বহুলাদেবী একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে অবস্থান করিতেছেন। কেহ কেহ বলেন, পূর্ব্বে এই মূর্ত্তি এই স্থান হইতে এক মাইল দূরে মরাঘাটে ছিলেন, পরে তাঁহাকে সেখান হইতে আনিয়া গ্রাম মধ্যে রাখা হয়, অল্প দিন হইল বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন, বহুলা এই গ্রাম মধ্যেই বরাবর ছিলেন, তাঁহারই দেবসেবার জন্য বহুলাপুর নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাঁহার নাম হইতেই কেতুগ্রামের পটী বহুলাপুরের নামকরণ হইয়াছে। তন্ত্রচূড়ামণি ও শিবচরিতের মতেও এই স্থানের নাম 'বহুলা' এবং এখানে ভগবতীর বামবাহু পতিত হওয়ায় এই স্থান মহাপীঠ মধ্যে ধরা হইয়াছে। বাস্তবিক বহুলাদেবী এবং তাঁহার বর্ত্তমান মন্দিরের পার্শ্বস্থ পুষ্করিণীর ঘাটে যে সকল পুরাতন কাটা-পাথর পড়িয়া আছে, তাহা দেখিলেই এই স্থান যে বহুদিনের পুরাতন, তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। বহুলার পুরোহিত মহাশয়ের নিকট শুনা গেল, এই গ্রামের পশ্চিমে ভূপাল-রাজার পাথরের দালান ছিল, বহুলার পুষ্করিণীর ঘাটে যে সকল কাটা-পাথর পাওয়া যায়, তাহা উক্ত দালানের ধ্বংসাবশেষ হইতে আনা হইয়াছে।

এখানে প্রবাদ আছে যে, কেতুগ্রামে চন্দ্রকেতু রাজা রাজত্ব করিতেন, এই চন্দ্রকেতু হইতেই কেতুগ্রাম নামের উৎপত্তি। চন্দ্রকেতুর রাজপ্রাসাদের নিকট এক পুষ্করিণীর সহিত অপর এক পুষ্করিণীর মধ্যে যাতায়াতের সুড়ঙ্গ ছিল। রাজবাটী পাথরের ছিল। তাঁহার সময়ে এখানে বিস্তর অট্টালিকা ও পাকা রাস্তা ছিল। এখনও এ অঞ্চলে সর্ব্বত্র মৃত্তিকা মধ্যে পুরাতন ইট পাওয়া যায়। বিশেষতঃ বর্ত্তমান কেতুগ্রাম থানার নিকট পুরাতন ভাঙ্গা ইটের ঢিবি আছে এবং তাহার চারিদিক খনন করিলেই বহু পুরাতন ইট বাহির হয়।

বহুলাদেবীর (বহুলাক্ষীর) পরিমাণ উচ্চতায় ২॥০ হাত, কালপাথরে গড়া, অতিসুন্দর মূর্ত্তি—দেখিলে নয়ন-মন মুগ্ধ হয়। দেবীর ডান পার্শ্বে গণেশ ও বাম পার্শ্বে শক্তিধর। মূল মূর্ত্তি সর্ব্বদাই কাপড়ে ঢাকা থাকেন। বহু অনুরোধের পর মূল মূর্ত্তি দেখিবার সুযোগ ঘটিলেও ছবি তুলিবার সময় পুরোহিত মহাশয় এককালে কাপড় সরাইতে রাজী হইলেন না। (৮ চিত্র দ্রষ্টব্য) এই অপূর্ব্ব মূর্ত্তির ধ্যান—

"ধ্যায়েচ্ছ্রীবহুলাং নগেন্দ্রতনয়াং পদ্মাসনস্থাং শুভাম্।
দোর্ভিঃ কঙ্কতিকাং বরাভয়যুতাং (ত্রিনয়নাং) বামে স্বপুত্রান্বিতাম্॥
*　　*　　*　　*
গৌরাঙ্গীং মণিহারকণ্ঠনমিতাং চিন্ত্যাং সুখাং কামদাম্॥"

অর্থ—হিমালয়সুতা পদ্মাসনস্থিতা মঙ্গলা শ্রীবহুলাকে ধ্যান করিবে। (তাঁহার চারি হাতের মধ্যে এক হাতে) কাঁকুই, (অপর দুই হাতে) বর ও অভয়, বাম পার্শ্বে নিজ পুত্র। গৌরাঙ্গী, মণিহার দ্বারা নমিত কণ্ঠ, আনন্দময়ী, কামদাকে চিন্তা করিবে।

এই ধ্যানের মাত্র তিনটী চরণ পাওয়া যাইতেছে। ধ্যানে তিনটী হস্তের বর্ণনা আছে, বাকি চতুর্থ হস্তের কোন কথা নাই। কিন্তু মূর্ত্তির চতুর্থ হস্তে দর্পণ আছে। ধ্যানে আছে, 'বামে স্বপুত্রান্বিতাম্'। কিন্তু পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, মূর্ত্তির এক পার্শ্বে কার্ত্তিকেয় ও এক পার্শ্বে গণেশ আছেন। ধ্যানের অপ্রাপ্ত চরণটী পাওয়া গেলে এই সকল গোল মিটিয়া যাইবে বলিয়া বোধ হয়।

পুরোহিত মহাশয় উক্ত অসম্পূর্ণ-ধ্যানেই দেবীর পূজা করিয়া থাকেন। স্থানীয় লোকেরা শ্রীখণ্ডের ভূতনাথকে বহুলাক্ষীর ভৈরব বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তন্ত্রচূড়ামণি ও শিবরচিত উভয় গ্রন্থের মতেই বহুলাক্ষীর ভৈরবের নাম ভীরুক।

(মরাঘাট)

স্থানীয় আধুনিক লোকের বিশ্বাস, এখানকার বহুলাক্ষী ও অট্টহাসের ফুল্লরা এই উভয় লইয়া যুগ্মপীঠ। বাস্তবিক তাহা নহে। যাঁহাকে তাঁহারা এখন বহুলাক্ষী বলিতেছেন, তাঁহার প্রকৃত নাম বহুলা, উদ্ধৃত ধ্যানেই প্রকাশ। বহুলা ও বহুলাক্ষী দুই ভিন্ন দেবীমূর্ত্তি। শিবচরিতে বহুলা ও বহুলাক্ষী দুইটী বিভিন্ন পীঠশক্তি বলিয়া ধরা হইয়াছে। শিবচরিত-মতে যেখানে ভগবতীর ডান কুনুই পড়িয়াছিল, সেই স্থানের নাম রণখণ্ড, সেখানকার শক্তির নাম বহুলাক্ষী ও ভৈরবের নাম মহাকাল। আর যেখানে ভগবতীর বামবাহু পড়িয়াছিল সেই স্থানের নাম বহুলা, শক্তির নামও বহুলা, ভৈরবের নাম ভীরুক। বহুলা ও বহুলাক্ষী উভয় লইয়াই যুগ্মপীঠ। শিবচরিতে যে স্থান 'রণখণ্ড' নামে উক্ত হইয়াছে, সেই স্থানই এখন মরাঘাট নামে পরিচিত। (৯ চিত্র দ্রষ্টব্য) পূর্ব্বোক্ত বহুলা দেবীর মন্দির হইতে এক মাইল মধ্যে এখানে বহুলাক্ষী ছিলেন, এখন সেই মূর্ত্তির সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে শক্তির ভৈরব মহাকাল এখানে নূতন গৃহে বিদ্যমান। এই মরাঘাটে উত্তরবাহিনী 'কাঁদড়' আছে, ব্রহ্মখণ্ডে এই ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীই 'বকুলা' বা 'বহুলা' নামে কীর্ত্তিত হইয়াছে। অদ্যাপি এই মহাশ্মশানে বহু সাধু-সন্ন্যাসী আগমন করিয়া থাকেন।

অট্টহাস

পূর্ব্বোক্ত মরাঘাট হইতে ১ মাইল দূরে অট্টহাস। এই মহাপীঠ অতি প্রাচীন। কুব্জিকা-তন্ত্রের মতে, এই পীঠে চামুণ্ডা ও মহানন্দা দেবী অবস্থান করিতেছেন। তন্ত্রচূড়ামণি ও শিবচরিত-মতে এখানে ভগবতীর ওষ্ঠাংশ পতিত হয়, এখানকার শক্তি ফুল্লরা ও ভৈরব বিশ্বেশ বা বিশ্বনাথ। অদ্যাপি অট্টহাস মহাজাগ্রৎ মহাপীঠ বলিয়া পরিচিত। এই স্থানের পূর্ব্ব সমৃদ্ধির কিছুই নাই। ভগবতীর মূর্ত্তিও নাই। মুসলমান-বিপ্লবে সমস্তই নষ্ট হইয়াছে।



১০খ। অট্টহাসের চামুণ্ডা বা মহানন্দা



১০খ। অট্টহাসের বর্ত্তমান মন্দির



৮। কেতুগ্রামের বহুলাক্ষী



৯। কেতুগ্রামের পার্শ্বস্থ মরাঘাট—বহুলাপীঠস্থান

মূলপীঠস্থানে কিছুদিন পূর্ব্বে একটী ক্ষুদ্র কুঠরী ছিল, অল্পদিন হইল তাহারই উপর খেড়ুয়ার জমিদার দেবীদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয় একটী পাকাঘর (১০খ চিত্র দ্রষ্টব্য) ও রান্নাঘর প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন। ইহার অদূরে একটী উচ্চ স্তূপ রহিয়াছে, স্থানীয় লোকেরা এখানে পঞ্চমুণ্ডীর আসন দেখাইয়া থাকেন। কিন্তু এই স্তূপটী এখানকার পুরাকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ বলিয়া মনে হয়। ইহার উপর ও চারিপাশে বহু পাতলা ও ভাঙ্গা পুরাতন ইট পাওয়া যায়। এই স্তূপের নিকট শিবানন্দের সিদ্ধিস্থান ও রটন্তীর ভগ্ন মন্দির আছে।

এই পীঠে প্রত্যহই শিবাবলি হয়। দেবীর পূজার পর ভোগ লইয়া ডাকিলেই দলে দলে শিবা আসে। শনি ও মঙ্গলবারে এখানে বহু লোকে পূজা দিতে আসেন। দেবীর কৃপায় অনেকেরই অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়াছে, শুনা যায়। পীঠের পশ্চিম ধারে উত্তরবাহিনী 'কাঁদড়' বা স্রোতস্বতী আছে।

এখানকার পীঠদেবী ফুল্লরার জয়দুর্গার ধ্যানে পূজা হয়। যথা—

"কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈররিকুলভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দুরেখাং
শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈরুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাম্।
সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পূরয়ন্তীং
ধ্যায়েদ্দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশপরিবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ॥"

কিন্তু কুব্জিকাতন্ত্র-বর্ণিত চামুণ্ডা বা মহানন্দার সহিত এই ধ্যানের কোন সম্বন্ধ নাই।

দেবালয়ের বামপার্শ্বে একটী অতি পুরাতন পুষ্করিণী আছে। এই পুষ্করিণী হইতে একটী ভগ্ন দেবী-মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। (১০ক চিত্র দ্রষ্টব্য) মূর্ত্তিটী ভাঙ্গা হইলেও এমন সুন্দর ও অপূর্ব্ব শিল্পনৈপুণ্যযুক্ত দেবীমূর্ত্তি আমরা বড় একটা দেখি নাই। রাঢ়ে—বর্দ্ধমান-জেলায় ভাস্করশিল্পের কতদূর উন্নতি হইয়াছিল, এই ক্ষুদ্র মূর্ত্তিটী তাহার অতীত সাক্ষীর সামান্য নিদর্শন। ইহা কোন্ দেবীর মূর্ত্তি তাহা এখনও তন্ত্রশাস্ত্র খুঁজিয়া বাহির করিবার সুযোগ ঘটে নাই। দেবীর পাদদেশে একটী গর্দ্দভের আকৃতি থাকায় কেহ কেহ ইঁহাকে রাসভস্থা শীতলা মূর্ত্তি বলিয়া মনে করেন। কিন্তু শীতলার ধ্যানের সহিত অপর কোন অংশে এই দেবীর মূর্ত্তির মিল নাই। দেবীর পাদদেশে যে অস্পষ্ট মূর্ত্তি আছে, তাহা শিবারও রূপ হইতে পারে। কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে ভগবতীর যে জরতীবেশের উল্লেখ আছে, ঐ মূর্ত্তি যেন সেই ভাবের চণ্ডীদেবী বলিয়া মনে হয়। কুব্জিকাতন্ত্রে যে চামুণ্ডা বা মহানন্দার উল্লেখ আছে—এই সুপ্রাচীন মূর্ত্তিটী তাহার অন্যতর হইতে পারে।

অট্টহাসের সেবার জন্য বর্দ্ধমানরাজ হইতে ১০ বিঘা বাগান ও ২০ বিঘা চাষের জমি দেওয়া আছে।

অগ্রদ্বীপ

অগ্রদ্বীপ কাঁটোয়া মহকুমার অন্তর্গত ভাগীরথীতীরস্থ একটী প্রাচীন গণ্ডগ্রাম ও বর্দ্ধমান জেলার মধ্যে একটী প্রধান তীর্থ বলিয়া পরিগণিত। পূর্ব্বতন অগ্রদ্বীপ বর্ত্তমান অগ্রদ্বীপের

প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ উত্তরে ছিল, গঙ্গার গতি-পরিবর্ত্তনের সহিত গ্রামও ক্রমে সরিয়া আসিয়াছে। মহাপ্রভুর অভ্যুদয়ের পূর্ব্ব হইতেই অগ্রদ্বীপ সুপ্রাচীন তীর্থ বলিয়া গণ্য। দিগ্বিজয়প্রকাশে লিখিত আছে, বারাণসীতে গঙ্গাস্নান করিলে যেরূপ ফল হয়, বারুণীর দিন অগ্রদ্বীপে গঙ্গাস্নান করিলে সেইরূপ ফল হয়। এখানকার ফল মাহাত্ম্যের জন্য রাজা বিক্রমাদিত্য এখানে গঙ্গাস্নান করিতে আসিতেন। আজও বারুণী উপলক্ষে এখানে ১৫ দিনব্যাপী বড় মেলা হয়, তাহাতে প্রায় লক্ষ লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

অধুনা গোপীনাথ-বিগ্রহের জন্যই এই স্থান প্রসিদ্ধ। কুলাই গ্রামের বিবরণ-প্রসঙ্গে লিখিয়াছি যে, উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-ঘোষবংশে বাসুদেব, গোবিন্দ ও মাধব প্রভৃতি নয় ভাই জন্মগ্রহণ করেন। কাশীপুর বিষ্ণুতলায় সিংহ-বংশে গোবিন্দঘোষের বিবাহ হয়। পত্নীর মৃত্যুর পর সন্তানাদি না থাকায় তাঁহার সংসার-বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। তিনি অগ্রদ্বীপের নিকট গঙ্গাতীরে আসিয়া বাস করেন। এক দিবস মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তমণ্ডলী-পরিবৃত হইয়া ভাগীরথী-সলিলে অবগাহন করিতেছেন, এমন সময়ে গোবিন্দ তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি নবীন সন্ন্যাসীর তেজোময় অপূর্ব্ব মুখশ্রী দেখিয়া ভক্তিরসে আপ্লুত হইলেন, মহাপ্রভুর চরণে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "প্রভো! আমি সংসার চাই না, ধন মান ঐশ্বর্য্য চাই না, আত্মীয় স্বজন চাই না, কেবল তোমার ঐ চরণকমল সেবা করিতে চাই।"

এই কথা শুনিয়া গৌরাঙ্গদেব গোবিন্দকে সংসারের নানা প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহাকে সংসারে আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু গোবিন্দ কিছুতেই বিচলিত হইবার লোক নহেন। তিনি বলিলেন, "ধন মান ঐশ্বর্য্য সমস্ত দূর হউক, উহারা আমাকে আর জ্বালাইতে পারিবে না। এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া শ্রীচরণে স্থান দিন্।" এই বলিয়া তিনি চৈতন্যের পা জড়াইয়া ধরিলেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যও গোবিন্দকে প্রকৃত ভক্ত জানিতে পারিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং কহিলেন, "যদি নিষ্কাম ব্রত পালন করিতে পার, তাহা হইলে আমার সহিত থাকিতে পাইবে।" গোবিন্দ ইহা শুনিয়া মহানন্দে চৈতন্যের পদরেণু গ্রহণ করিলেন এবং নিষ্কাম ব্রত পালনে সম্মত হইলেন। পরে কিছুদিন তিনি মহাপ্রভুর সহিত মহানন্দে কাটাইলেন।

একদিন মহাপ্রভু আহারান্তে মুখশুদ্ধি না পাইয়া ভক্তগণের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আজ আর মুখশুদ্ধি হইল না।" শিষ্যগণ নীরব রহিলেন। গোবিন্দ অমনি কৃতাঞ্জলিপুটে প্রভুর সম্মুখে যাইয়া কহিলেন, "প্রভো! আমার নিকট একটী হরীতকী আছে; যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে আপনার সেবার জন্য অর্পণ করি।" এই কথায় শ্রীচৈতন্য হাসিয়া উঠিলেন। তিনি কহিলেন, "গোবিন্দ! তোমার ভক্তির সামগ্রী আমি আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করিলাম। কিন্তু আজ হইতে তুমি আমার সঙ্গ পরিত্যাগ কর।" গোবিন্দের মস্তকে যেন অকস্মাৎ বজ্রাঘাত হইল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "দেব! দাস এমন কি অপরাধ করিয়াছে, যাহার জন্য এ কঠোর আদেশ করিলেন?"

চৈতন্যদেব কহিলেন, "গোবিন্দ! তুমি যথার্থ ভক্ত ও হরিপূজার অধিকারী। কিন্তু নিষ্কাম ব্রত পালনে উপযুক্ত নও, এখনও তোমার বিষয়-বাসনা দূর হয় নাই, এখনও তোমার সঞ্চয়-স্পৃহা আছে। তাই বলিতেছি, গৃহে ফিরিয়া যাও, হরির আরাধনা করিও, তাহাতেই মুক্তি হইবে।" "আমি কিছু চাই না, সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়াছি, আর সংসারে ফিরিব না"—দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সজল নয়নে গোবিন্দ এই কএকটী কথা বলিলেন।

চৈতন্যদেব ভক্তশ্রেষ্ঠ গোবিন্দকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "গোবিন্দ! তুমি যথার্থই সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াছ, কিন্তু এখনও তোমার সম্মুখে বিষম কণ্টক রহিয়াছে। আজ একটী হরীতকী সঞ্চয় করিয়াছ, কাল আবার আর একটী সঞ্চয়ের ইচ্ছা হইবে, পরশ্ব আর একটী। এইরূপ কামনাই নিষ্কাম ব্রত-পালনের ঘোর অন্তরায় জানিবে। সেই জন্য বলিতেছি, তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও। যেদিন তোমার জীবনে কোন অলৌকিক ঘটনা ঘটিবে, সেই দিন আবার আমার দর্শন পাইবে। যদি কোন অলৌকিক দ্রব্য পাও, যত্নসহকারে রাখিয়া দিও। তোমার আশা পূর্ণ হইবে।" মহাপ্রভু এই প্রকারে গোবিন্দকে পরিত্যাগ করিলেন। গোবিন্দ অগ্রদ্বীপে আসিয়া "আবার কবে প্রভুর দর্শন পাইব"—এই আশায় নির্ভর করিয়া রহিলেন।

এইরূপে বহুদিন গত হইল। শুভ মধুমাস আসিল। এক দিন ভক্তপ্রবর গোবিন্দ জাহ্নবীসলিলে আবক্ষ নিমগ্ন হইয়া ধ্যানে নিরত রহিয়াছেন, এমন সময়ে কি একটা জিনিস আসিয়া তিনবার তাঁহার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিল। তিনি চাহিয়া দেখেন, শবদাহের এক খণ্ড ক্ষুদ্র কাষ্ঠ। তিনি সেই কাঠখানি তীরে তুলিয়া রাখিলেন। কিন্তু তুলিবার সময় বুঝিলেন যে, ঐ কাঠখানি স্বাভাবিক গুরুত্ব অপেক্ষা শতগুণ ভারী। একি হইল! বিস্ময়ে গোবিন্দের মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইল। তিনি কুটীরে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু মনের সেই অপার্থিব ভাব কিছুতেই দূর হইল না—এই চিন্তায় সমস্ত দিন অতিবাহিত হইল। রাত্রিকালে স্বপ্ন দেখিলেন, শঙ্খচক্রগদাধর যেন তাঁহাকে বলিতেছেন, "গোবিন্দ! ভুল না, ভুল না, সেই কাঠখানি তুলিয়া আনিয়া গৃহে রাখ। মহাপ্রভু আসিতেছেন, আসিলে তাঁহাকে দিও।"

গোবিন্দের নিদ্রা ভাঙ্গিল, দেখিলেন চতুর্দ্দিকে ঘোর অন্ধকার। তিনি সেই নিবিড় অন্ধকারে যেন কোন কুহকের বলে আকৃষ্ট হইয়া গঙ্গাতীরে আসিলেন, এখানে আসিয়া দেখিলেন, সেই কাঠখানি যথাস্থানে পড়িয়া আছে। গোবিন্দ অতি যত্নে কাঠখানি স্কন্ধে লইয়া ধীরে ধীরে কুটীরে আনিয়া রাখিলেন। সে রাত্রি আর তাঁহার চক্ষে নিদ্রা আসিল না। ক্রমে প্রভাত হইল। গোবিন্দ অরুণের আলোকে দেখিতে পাইলেন, সেখানি শবদাহের কাষ্ঠ নয়—এক খানি সমুজ্জ্বল কৃষ্ণ-প্রস্তর। গোবিন্দ চমকিয়া উঠিলেন। চৈতন্যদেবের কথাগুলি তাঁহার স্মরণ হইল।

বেলা দ্বিপ্রহর সময়ে গোবিন্দ গ্রাম-মধ্যে ভিক্ষা করিতে বহির্গত হইলেন। ভিক্ষান্তে কুটীরে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, কুটীর-দ্বারে চৈতন্যদেব। ভক্তপ্রধান গোবিন্দ চৈতন্যদেবকে

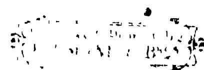
দেখিয়া পুলকে পূরিত হইয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। গোবিন্দের ভক্তিদর্শনে চৈতন্যেরও প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি গোবিন্দকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "যাহা বলিয়াছিলাম, তাহার কিছু হইয়াছে?" গোবিন্দ সকল কথাই ব্যক্ত করিলেন। তখন চৈতন্যদেব বলিলেন, "গোবিন্দ! তোমার আর কোন চিন্তা নাই। ভগবান্ তোমার মঙ্গলের জন্য ঐ শিলা পাঠাইয়াছেন। কল্য এক ভাস্কর আসিয়া ঐ শিলা হইতে শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ নির্ম্মাণ করিবে। সেই বিগ্রহ আমি প্রতিষ্ঠা করিব ও তুমি তাঁহার সেবাইত হইবে।"

পর দিন যথাকালে এক অজ্ঞাতকুলশীল অপরিচিত ভাস্কর আসিয়া মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া সকলের অসাক্ষাতে চলিয়া গেল। সকলেই দেখিলেন—নবদূর্ব্বাদলশ্যাম বঙ্কিম কৃষ্ণবিগ্রহ প্রস্তুত হইয়াছে। চৈতন্যদেব তাঁহার প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং গোবিন্দ ঘোষ তাঁহার পূজক নিযুক্ত হইলেন। ঐ কৃষ্ণবিগ্রহের নামই গোপীনাথ। (১১ চিত্র দ্রষ্টব্য) গোবিন্দ ঘোষই পরে 'ঘোষ-ঠাকুর' নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।

গোপীনাথ বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার পর ঘোষ-ঠাকুর বহু দিন জীবিত ছিলেন। ঐ সময়ে তিনি বহুসংখ্যক শিষ্য ও বিস্তর দেবোত্তর সম্পত্তি পাইয়াছিলেন। মৃত্যুর কয়েক দণ্ড পূর্ব্বে তিনি শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন, "আমি চলিলাম, আজ আমার অন্তিমকাল উপস্থিত। তোমরা যথারীতি প্রভুর সেবা করিও। মহাপ্রভুর আজ্ঞা—আমার প্রাণ বাহির হইলে যথাসময়ে গোপীনাথদেব যেন আমার শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করেন। আমার দেহ দাহ করিও না, গ্রামের এক পার্শ্বে সমাধি দিও।" এই বলিয়া ভক্তবর গোবিন্দ ইহলোক পরিত্যাগ করেন। প্রবাদ এইরূপ, সেই দিন গোপীনাথের চক্ষেও বিন্দু বিন্দু জল দেখা দিয়াছিল। চৈত্রমাসে কৃষ্ণা একাদশীতে গোপীনাথ শ্রাদ্ধীয় বাস ও কুশাঙ্গুরী পরিয়া সেবকের পুত্ররূপে শ্রাদ্ধ করিলেন। এখনও প্রতি বৎসর ঐ দিনে গোপীনাথ কর্ত্তৃক ঘোষ-ঠাকুরের শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে।

গোপীনাথ দর্শন করিবার জন্য বহু দূরদেশ হইতে ভক্ত বৈষ্ণবগণ এখানে আগমন করিতেন। তাহাতে যথেষ্ট আয় হইত। ঘোষ-ঠাকুরের ভ্রাতৃবংশধরগণ আসিয়া সেবা চালাইতেন। ক্রমে তাঁহাদের প্রভাব রাঢ় ছাড়িয়া পূর্ব্ববঙ্গে পঁহুছিল। পূর্ব্ববঙ্গের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহাদের কাহারও কাহারও শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন, তাঁহারাও শিষ্যসম্পত্তি রক্ষার জন্য অনেকে পূর্ব্ববঙ্গ আশ্রয় করিলেন। এই সঙ্গে তাঁহাদের হৃদয়ে গোপীনাথ-বিগ্রহ লইয়া যাইবার আশা বলবতী হইল। কিন্তু তাঁহাদের যে সকল সরিক রাঢ়ে ছিলেন, তাঁহারা গোপীনাথকে ছাড়িতে সম্মত হইলেন না। পূর্ব্ববঙ্গগামী ঘোষবংশীয়গণ একদিন গোপনে গোপীনাথকে লইয়া চলিলেন, জ্ঞাতিগণ সংবাদ পাইয়া পথ আট্‌কাইলেন, কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে বেশী লোকজন থাকায় জ্ঞাতিগণ ফিরিয়া আসিলেন এবং তৎকালের পাটুলীর উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থরাজের নিকট বিগ্রহ উদ্ধার করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। পাটুলীর রাজারা তৎক্ষণাৎ একদল সৈন্য পাঠাইয়া কুষ্টিয়ার নিকট

৩। [illegible]



হইতে গোপীনাথকে উদ্ধার করিয়া আনিলেন এবং পাটুলীর রাজবাটীতেই কিছুকাল রাখিয়া দিলেন। এইরূপে গোপীনাথ ঘোষবংশের হাতছাড়া হইলেন। পাটুলীর রাজা অগ্রদ্বীপ ও নিকটবর্ত্তী জমিদারী গোপীনাথের সেবার জন্য অর্পণ করেন এবং চৈত্র-একাদশীর দিন অগ্রদ্বীপে গোপীনাথকে পাঠাইয়া পূর্ব্ববৎ শ্রাদ্ধাদি উৎসব নির্ব্বাহ করিতেন। একবার মেলায় বহু লোকের জনতায় কতকগুলি লোক মারা যায়। এ সংবাদ পাইয়া মুর্শিদাবাদের নবাব স্থানীয় জমিদারকে কারণ দর্শাইতে হুকুম দেন। মুর্শিদাবাদসরকারে পাটুলীর পক্ষে যিনি উকীল ছিলেন, তিনি নিজ প্রভুর সমূহ বিপদের সম্ভাবনা দেখিয়া ভয়ে কিছুই বলিলেন না। মোকদ্দমার ডাক হইলে নদীয়া-রাজের উকীল উঠিয়া বলিলেন, 'হুজুর! সেখানে লক্ষ লক্ষ লোকের ভিড় হয়। এত ভিড়ের মধ্যে দুই চারি জন মরিবে, তাহা কিছু অসম্ভব নহে। তবে আমার প্রভু নবদ্বীপরাজ ভবিষ্যতে বিশেষ সাবধান হইবেন।' উপযুক্ত উত্তর শুনিয়া নবাব সন্তুষ্ট হইলেন। নবদ্বীপের উকীলের কৌশলে সেই দিন হইতে গোপীনাথসহ অগ্রদ্বীপ-জমিদারী নবদ্বীপের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অধিকারভুক্ত হইল। যেখানে গোবিন্দ ঘোষ-ঠাকুরের সমাধি ছিল, তাহারই পার্শ্বে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র গোপীনাথের বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন।

ভূকৈলাসের মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষালের পিতা মহাশয় কৃষ্ণচন্দ্র ১১৭১ সালে ত্রিস্থলী করিয়া ফিরিবার সময় অগ্রদ্বীপে নামিয়াছিলেন। সহযাত্রী কবি দ্বিজরাম তীর্থমঙ্গলে লিখিয়াছেন—

"অগ্রদ্বীপ আসি নৌকা হৈল উপস্থিত ॥ ১০১২
সেই স্থানে গোপীনাথ ঠাকুরের ঘর।
অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ বাটী দেখিতে সুন্দর ॥ ১০১৩
রাজা নবকৃষ্ণের বাড়ী আছেন গোপীনাথ।
দর্শন না পায়্যা যাত্রী মাথে মারে ঘাত ॥" ১০১৪

কলিকাতার শোভাবাজার-রাজবাটীতে প্রবাদ আছে যে, মহারাজ নবকৃষ্ণের মাতৃশ্রাদ্ধে অথবা তাঁহার গোবিন্দজী প্রতিষ্ঠাকালে রাঢ়বঙ্গে যত বিষ্ণুবিগ্রহ ছিলেন, রাজা নবকৃষ্ণ সে সকলকেই নিজ প্রাসাদে আনাইয়া ছিলেন। কার্য্যান্তে সকল দেবই ফিরিয়া গেলেন, কিন্তু গোপীনাথের মোহন মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি আর তাঁহাকে ফিরাইয়া দিলেন না। এই বিগ্রহ লইয়া নবদ্বীপাধিপতির সহিত মহারাজ নবকৃষ্ণের বিবাদ উপস্থিত হয়। কিন্তু অগ্রদ্বীপে প্রবাদ আছে যে, মহারাজ নবকৃষ্ণ গোপনে গোপীনাথ বিগ্রহ কলিকাতায় লইয়া যান। সমসাময়িক ইংরাজলেখক ওয়ার্ডসাহেব কিন্তু লিখিয়াছে —

"গোপীনাথের অধিকারী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রাজা নবকৃষ্ণের নিকট তিন লক্ষ টাকা ধারিতেন। সেই জন্য রাজা নবকৃষ্ণ অগ্রদ্বীপের গোপীনাথকে লইয়া যান। অবশেষে কৃষ্ণনগরপতি মোকদ্দমা করিয়া সেই মূর্ত্তি উদ্ধার করেন।"*

* Ward's History of the Hindoos, Vol. I. p. 205-206.

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে গোপীনাথের সেবার জন্য প্রত্যহ ৫০৲ টাকা নির্দ্দিষ্ট ছিল, তৎপরে ২৫৲ টাকা হয়, ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসিয়া এখন দৈনিক ৷৷০ আনা ব্যবস্থা হইয়াছে।

তীর্থমঙ্গলে গোপীনাথের যে "অপূর্ব্ব-নির্ম্মাণ বাটী"র উল্লেখ আছে, ভীষণ ভূমিকম্পে তাহার অধিকাংশই ভগ্ন হইয়াছে। সংস্কারাভাবে মূল-মন্দিরের উভয় পার্শ্বে নাটমন্দির ও ভোগগৃহ ধ্বংসপ্রায়। মূল-মন্দির সামান্য সংস্কারের ফলে এখনও দাঁড়াইয়া আছে বটে, কিন্তু উপযুক্ত সংস্কার না হইলে শীঘ্রই ধ্বংসমুখে পতিত হইবে।

অগ্রদ্বীপ গ্রামে বাগানের মধ্যে মেলা হয়। গ্রামের মধ্যে ও মেলাস্থানের নিকট বর্দ্ধমানরাজদত্ত মহাপ্রভুর সেবা আছে। তাহারই নিকট রাধাকান্তজী আছেন, নাটোর-রাজদত্ত বৃত্তিতে তাঁহার সেবা চলে। এখানে সকল জাতির বাস আছে, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণের সংখ্যাই অধিক।

ঘোড়াইক্ষেত্র

অগ্রদ্বীপ হইতে ৩ মাইল উত্তরে ঘোড়াইক্ষেত্র নামক প্রাচীন স্থান। বিজয়রামের তীর্থমঙ্গল পাঠে জানিতে পারি যে, দেড় শত বর্ষ পূর্ব্বে এই ঘোড়াইক্ষেত্রের পার্শ্ব দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত ছিলেন—

"কাশীপুর ঘোড়াইক্ষেত্র কন্যা গাজীপুর।
ডাহিনে রাখিয়া চলে ঘোষাল ঠাকুর॥
সন্ধ্যার সময় সবে আইলা গোটপাড়া।
গুড় গুড় গুড় গুড় দামায় পড়ে সাড়া॥
সেই স্থানে কালুরায় মহাশয়ের ঘর।
সোয়ারীতে কৃষ্ণচন্দ্র গেলা শীঘ্রতর॥"

(তীর্থমঙ্গল ১০১৭—১০১৯ শ্লোক)

বর্ত্তমান ঘোড়াইক্ষেত্র হইতে গঙ্গা প্রায় ১ ক্রোশ দক্ষিণে সরিয়া গিয়াছেন। ঘোড়াই-ক্ষেত্রের বর্ত্তমান কালীতলার পার্শ্ব দিয়াই গঙ্গা বহিতেন। গঙ্গার গতি-পরিবর্ত্তনের সহিত এই স্থান নিবিড় জঙ্গলে পরিণত হয়, অল্পদিন হইল জঙ্গল কাটা হইয়াছে। ইহার অপর পারে নোহাসায় কালুর ঘাট। এখানকার নোহাসার বিল প্রাচীন গঙ্গাগর্ভের পরিচয় দিতেছে। এই বিল বরাবর গোটপাড়ায় গিয়া গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে।

বহু পূর্ব্ব হইতে ঘোড়াইক্ষেত্র তান্ত্রিকপ্রধান স্থান। কুব্জিকাতন্ত্রে যে অশ্বতীর্থ বা অশ্বপদ পীঠের উল্লেখ আছে, কালীতলার নিকট সেই প্রাচীন পীঠ ছিল, বহু কাল হইল গঙ্গা সেই স্থান আপনার কুক্ষিগত করিয়াছেন। তৎপরেও এখানে বহু সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগম হইত। কিন্তু গঙ্গার গতি-পরিবর্ত্তনের সহিত ইহার মাহাত্ম্য বিলুপ্ত হইয়াছে। তবে এখনও পীঠস্থান ভাবিয়া মধ্যে মধ্যে কালীতলায় সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগম হইয়া থাকে।

দেবগ্রাম*

বর্ত্তমান নদীয়া জেলার উত্তরাংশে রাণাঘাট-মুর্শিদাবাদ-রেলপথের দেবগ্রাম ষ্টেশন হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে এবং অগ্রদ্বীপ হইতে তিন ক্রোশ উত্তরে দেবগ্রাম অবস্থিত।

বর্ত্তমান দেবগ্রাম বাগড়ীবিভাগের মধ্যে পড়িয়াছে, ইহার আয়তন প্রায় সাড়ে চৌদ্দ হাজার বিঘা। এই ভূভাগের উত্তরসীমা পাণিঘাটা ও গোবিন্দপুর, দক্ষিণে সাতবেগে, ভাগা, চাঁদপুর ও বনপলাশী, পূর্ব্বে বরেয়া ও দিক্‌বরেয়া, পূর্ব্ব-দক্ষিণে জয়নগর এবং পশ্চিমে সেওড়াতলা ও হাটগাছা। উত্তর-সীমার মধ্যে লুপ্ত গঙ্গার খাত পাগলাই চণ্ডীর দহ বা পাণিঘাটার দহ, পাণিঘাটার দক্ষিণে ও দেবগ্রামের উত্তরপশ্চিমসীমায় দেবগ্রামের পাড়া পাথরজলা বা নূতনগ্রামের গড়। গ্রামবাসী বৃদ্ধ ভদ্রমহোদয়গণের বিশ্বাস যে, গোবিন্দপুর ও গড়ের পার্শ্ব দিয়া পূর্ব্বকালে গঙ্গা প্রবাহিত হইতেন, গঙ্গার খাদের উপরই বর্ত্তমান মীরেগ্রাম। এখানে শুকুইআরা, ডোখলঘাট, ধোবাঘাট প্রভৃতি স্থান আছে। দেবগ্রামের উত্তর ও পূর্ব্বে যেখানে গঙ্গার গর্ভে জল থাকে, সেই স্থান অদ্যাপি দহ বা বিল নামে পরিচিত। শুষ্ক গঙ্গাগর্ভ বর্ষাকালে ডুবিয়া যায়। দেবগ্রামের পূর্ব্বে (বর্ত্তমান দেবগ্রাম ষ্টেশনের পার্শ্বে) দুর্গাপুর, তাহার পার্শ্বে গহড়াপোতা; ইহার মধ্যে নৌকাঘাটা বা 'নাঘাটার মাঠ'—এখানে বর্ষাকালে ৮।১০ হাতের উপর জল চলে।

দেবগ্রামের অবস্থান

দেবগ্রাম অতি পূর্ব্বকাল হইতে একটী মহাসমৃদ্ধিশালী লোকালয় বলিয়া পরিচিত ছিল। পূর্ব্বকালে যখন ইহার পূর্ব্ব পার্শ্ব দিয়া গঙ্গার স্রোত প্রবাহিত ছিল, তৎকালে বর্ত্তমান সাঁওতার পূর্ব্বোত্তরে নাঘাটা বা নৌকাঘাটা নামক স্থানে বড় বড় বাণিজ্যপোত আসিয়া লাগিত। সাঁওতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানেই তৎকালে বহু লোকের বাস ছিল, দক্ষিণে বিক্রমপুর ও উত্তরে মীরে বা মীরগ্রাম† এবং পশ্চিমে কালীগঞ্জ হইতে ঘোড়াইক্ষেত্র পর্য্যন্ত ইহার অন্তর্গত ছিল। বর্ত্তমান সাতবেগে‡ এই বিস্তীর্ণ

দেবগ্রামের প্রাচীনত্ব

---

* এই প্রাচীন স্থানের পরিচয় পূর্ব্বে বড় প্রকাশ ছিল না। ইহার প্রাচীনত্বের সন্ধান পাইয়া আমি ক্রমান্বয়ে চারিবার ঐ স্থানে গিয়াছিলাম। প্রথম দুইবারে ঐ স্থানের প্রাচীন অধিবাসী কৃষকদিগের নিকট এবং তৃতীয় ও চতুর্থ বারে গ্রামবাসী ভদ্র মহোদয়গণের নিকট স্থানীয় কিংবদন্তী শুনিয়া প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ও পুরাকীর্ত্তিগুলি দেখি। ৪র্থ বারে (গত ১৩ই চৈত্র) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ও পুরাতত্ত্বানুরাগী শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমার সঙ্গে ঐ সকল স্থান ও বিক্রমপুর পরিদর্শন করিবার জন্য গিয়াছিলেন। এই কএক বারের অনুসন্ধানের ফলে এবং শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিভুতিভূষণ মজুমদার প্রভৃতি গ্রামবাসী ভদ্র মহোদয়গণের নিকট হইতে যেরূপ কিংবদন্তী সংগৃহীত হইয়াছে এবং আমরা স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছি, তাহাই লিখিত হইল।

† ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডে দেবগ্রামের উল্লেখ না থাকিলেও এই মীরগ্রামের উল্লেখ আছে।

‡ পূর্ব্বকালে একটী বেগেই ছিল, কিছু দিন হইল উহার সাতভাগ হইয়াছে। এই সাতবেগের নাম পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে যথাক্রমে ১ চিনিমিনি বেগে, ২ স্থাপন বেগে, ৩ চক বেগে, ৪ গড়ের বেগে, ৫ আড়ার বেগে, ৬ খোরদ বেগে ও ৭ পালিত বেগে।

নগরীর মধ্যেই ছিল। এই ভূভাগের মধ্যে এখনও স্থানে স্থানে বহু প্রাচীন ইষ্টকাদির নিদর্শন ও বহু সংখ্যক সুপ্রাচীন মজা পুকুর দেখিতে পাওয়া যায়। দেবগ্রামের সর্ব্বপ্রাচীন স্মৃতি সম্ভবতঃ মঞ্জুশ্রী।* এখন ইনি কুলুইচণ্ডী নামে গ্রামের অধিষ্ঠাত্রীরূপে সকলের পূজা পাইতেছেন। এখানে যে এক সময় বৌদ্ধপ্রভাব ছিল, এই মঞ্জুশ্রীই তাহার নিদর্শন। (১২ চিত্র দ্রষ্টব্য)

দেবকুণ্ড

দেবগ্রামে যত পুষ্করিণী আছে, তন্মধ্যে দেবকুণ্ড সর্ব্বপ্রাচীন ও সর্ব্ববৃহৎ—পূর্ব্বে প্রায় দেড়শত বিঘায় জল থাকিত। তাহার পশ্চিমে ফুলবাগান এবং অপর তিন দিকে লোকের বাস ও মধ্যে মধ্যে দেবালয় ছিল। এখন দেবকুণ্ডের অধিকাংশই ভরাট হইয়াছে, যেটুকু জল আছে, তাহা তিনটী পুষ্করিণী, ৪টী জোল এবং দক্ষিণে একটী লম্বা জোলে বিভক্ত রহিয়াছে। (১৩ চিত্র দ্রষ্টব্য) উত্তরাংশ অধিকাংশই ভরাট হইয়া গিয়াছে এবং তন্মধ্যে এখন অনেক অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে। পুরাতন ফুলবাগান এখন নামমাত্র—একটী পাড়া হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান দেবকুণ্ড-সংস্কারকালে ইহার মধ্য হইতে নানা লোকে নানা দেবমূর্ত্তি পাইয়াছে, তাহার কতকগুলি দেবকুণ্ডের পার্শ্ববর্ত্তী ব্রাহ্মণ-গৃহে আছে, কতক কতক স্থানান্তরে গিয়াছে। কিছুদিন হইল, এই দেবকুণ্ড হইতে কষ্টিপাথরের একটী অতি সুন্দর বাসুদেব মূর্ত্তি পাওয়া যায়। সেই মূর্ত্তিটী দেবগ্রামভব স্বনামধন্য ডাক্তার উমাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আপনার কলিকাতার বাসায় আনিয়া রাখিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সাহিত্যসম্মেলনে প্রদর্শন করিবার জন্য তিনিই উহা আমায় অর্পণ করিয়াছেন। (১৪ চিত্র দ্রষ্টব্য)। এই মূর্ত্তির শিল্পনৈপুণ্য ও গঠন দেখিলে ৬।৭ শত বর্ষের প্রাচীন মূর্ত্তি বলিয়া মনে হইবে।

পচা-দীঘী

গ্রামের উত্তরাংশে 'লালদীঘী' নামে একটী প্রাচীন পুষ্করিণী আছে, পূর্ব্বে ইহার 'পচাদীঘী' নাম ছিল। ১২৮০ সালে এই দীঘীর সংস্কার-কালে ব্রহ্মাণী বা মাহেশ্বরী মূর্ত্তিযুক্ত একখণ্ড পাথর† (১৫ চিত্র দ্রষ্টব্য), হাতীর মাথা এবং ইষ্টকস্তূপ বাহির হয়। এই স্তূপ হইতে এত পুরাতন ইট উঠিয়াছিল যে, তাহাতে ইহার নিকট একটী পাকা কোটা প্রস্তুত হইয়াছে। ওরূপ দেবীমূর্ত্তিশোভিত প্রস্তরফলক সাধারণতঃ দেবমন্দিরের বহির্গাত্রে সংলগ্ন থাকে এবং তাহা হইতে মূল মন্দির কত বড় ছিল, তাহাও কতকটা বুঝা যায়।

দেবগ্রামের গড়

দেবগ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং উত্তরে এখনও সুপ্রাচীন গড়ের চিহ্ন বিদ্যমান। উত্তরের গড়টী প্রায় দৈর্ঘ্যে ১ মাইল, প্রস্থে প্রায় দুইশত ফুট এবং ইহার বর্ত্তমান উচ্চতা ৬ ফুট হইতে ১৫ ফুট পর্য্যন্ত জঙ্গলে পরিপূর্ণ।

---

* শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই মূর্ত্তিটীকে "মহারাজলীল মঞ্জুশ্রী" বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু বৌদ্ধ তন্ত্রে মঞ্জুশ্রীর যেরূপ সাধন লিখিত আছে, তাহার সহিত মিল নাই। তবে মূর্ত্তিটী যে সহস্রাধিক বর্ষের প্রাচীন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

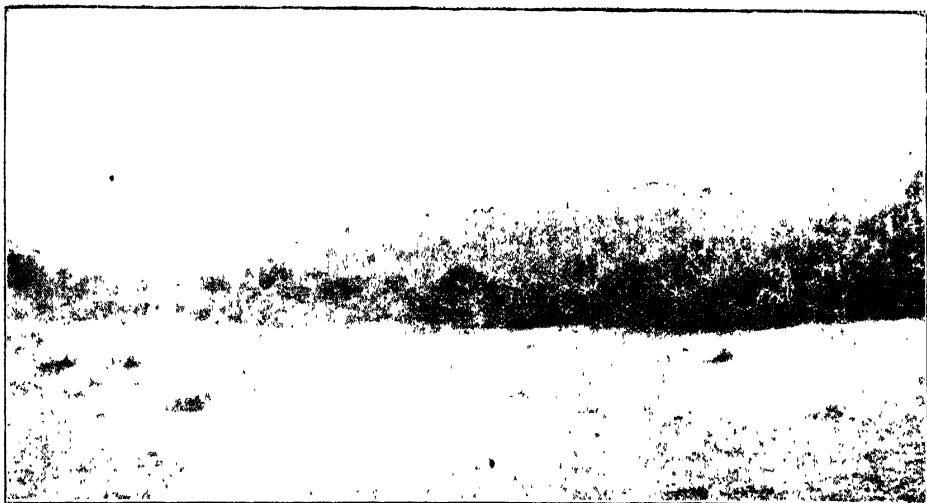
† এই মূর্ত্তির বাহন ও লাঞ্ছন অস্পষ্ট হওয়ায় ইনি ব্রহ্মাণী কি মাহেশ্বরী তাহা এখনও স্থির হয় নাই।



১৫। দেবগ্রাম—দেবকুণ্ড হইতে প্রাপ্ত বাসুদেব



১২। দেবগ্রাম—কুলাই চণ্ডী (প্রাচীন মঞ্জুশ্রী)



১৬। দেবগ্রামের পার্শ্বস্থ প্রাচীন গড়

১৭। দেবগ্রাম—বিভক্ত দেবকুণ্ড

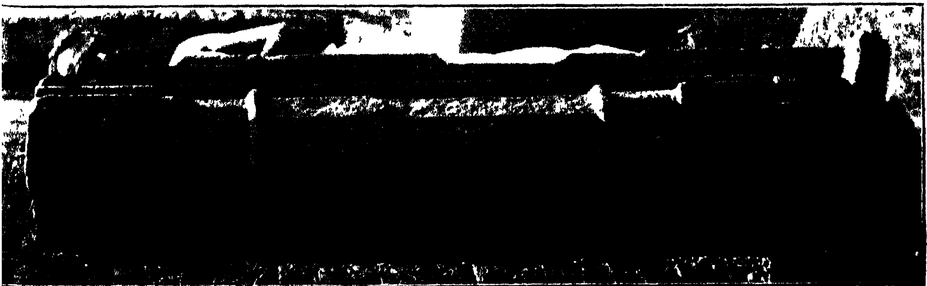


১৮। বল্লালের ভিটা হইতে প্রাপ্ত বিষ্ণুর সহচরী



১৫। দেবগ্রাম হইতে প্রাপ্ত মাহেশ্বরী (?) মূর্তিযুক্ত প্রস্তর

১৭। বল্লালসেনের ভিটা বা দমদমার স্তূপ



২১। বল্লালের ভিটা হইতে প্রাপ্ত স্তম্ভাংশ

ইহার দুই পার্শ্বেই পরিখার চিহ্ন রহিয়াছে। (১৬ চিত্র দ্রষ্টব্য)। দক্ষিণপশ্চিমাংশের গড়টী 'বেগের গড়' বা 'গড়বেগে' নামে পরিচিত। প্রবাদ—এই গড়ে পাতালঘর আছে। তাহাতে এখানকার পূর্ব্বতন নৃপতির গুপ্তধন রক্ষিত আছে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস।

দেবগ্রামের অবস্থান দেখিয়া প্রাচীন লোকেরা মনে করেন যে, ইহার দুই পার্শ্বে গড় ও দুই পার্শ্বে স্রোতস্বতী এই স্থানকে সুদৃঢ় করিয়া রাখিয়াছিল। এখন এইস্থান বাগড়ীর মধ্যে পড়িলেও যে সময়ে ইহার পূর্ব্ব দিয়া গঙ্গা বহিতেন, সেই সময় এইস্থান রাঢ়দেশেরই সামিল ছিল। রামচরিতে পাইয়াছি—

"**দেবগ্রাম**প্রতিবদ্ধ বসুধাচক্রবাল-**বালবলভী**তরঙ্গবহল-গলহস্তপ্রশস্তহস্তবিক্রমো **বিক্রমরাজঃ**"।

রামচরিতের বিক্রমরাজ যে, বর্ত্তমান দেবগ্রাম অঞ্চলে আধিপত্য করিতেন, তাহার আলোচনা পরে করিব। তবে এখানে বলিয়া রাখি, রামচরিত হইতে আমরা পাইতেছি যে, পালবংশের অধিকারকালে খৃষ্টীয় ১১শ ও ১২শ শতাব্দীতে এই দেবগ্রাম একটী প্রসিদ্ধ স্থান বলিয়া পরিচিত ছিল। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে গুরবমিশ্রের গরুড়স্তম্ভলিপিতে বর্ণিত হইয়াছে—

"**দেবগ্রামভবা** ধন্যা দেবীস্থ তুল্যবলয়ালোকসন্দীপিতরূপা।
দেবকীব তস্মাদ্‌গোপালপ্রিয়কারকমসূত পুরুষোত্তমম্‌॥"

এই শিলালিপির প্রমাণেও আমরা বলিতে পারি যে, খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর পূর্ব্ব হইতেই দেবগ্রাম প্রসিদ্ধ ছিল। এই স্থানে গৌড়েশ্বর নারায়ণপালের প্রধান মন্ত্রী গুরবমিশ্রের মাতুলালয় ছিল বলিয়া তাঁহার প্রশস্তিকার সগৌরবে এই দেবগ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন।

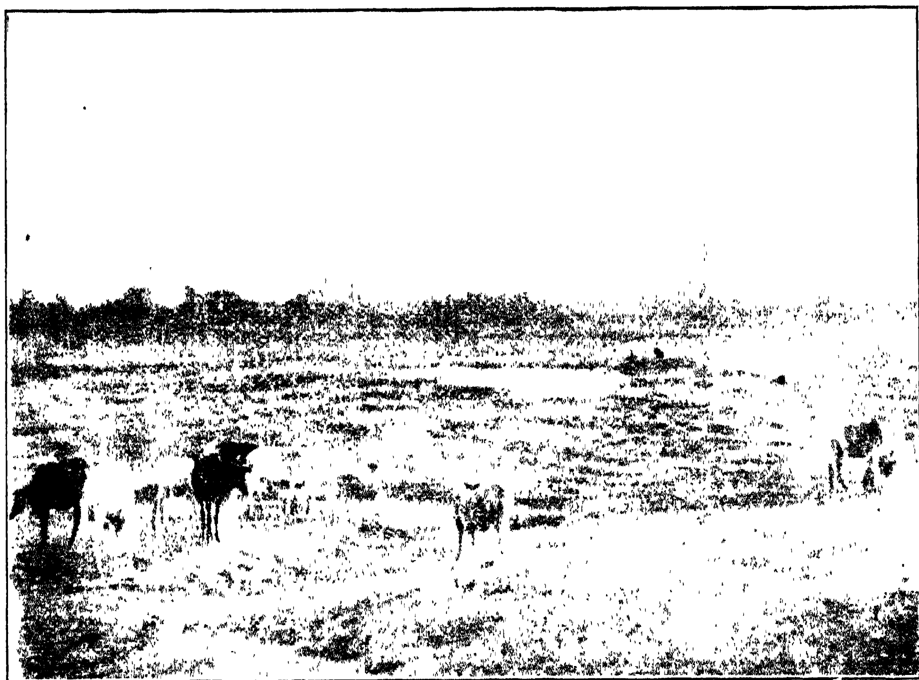
পূর্ব্বোক্ত গহড়াপোতার নিকট (বর্ত্তমান দেবগ্রামের পূর্ব্বভাগে) দমদমা। এখানে একটী উচ্চ স্তূপ বা ঢিবি আছে—স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি সাবেক অধিবাসিমাত্রই ঐ ঢিবিকে 'বল্লালের ভিটা' বা 'বল্লালসেনের বাড়ী' বলিয়া থাকে। এই স্থানে এবং ইহার উত্তর ও পূর্ব্বে ভীষণ জঙ্গল ছিল, অনেকে এখানে আসিয়া বাঘ শীকার করিত। অল্প দিন হইল জঙ্গল পরিষ্কার হইয়াছে। (১৭ চিত্র দ্রষ্টব্য) ইহারই পার্শ্বে সাঁওতার দীঘী। ইহার উপর দিয়া ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের যত্নে বহরমপুররোড হইবার পূর্ব্বে বল্লালের ভিটা ও সাঁওতার দীঘী পাশাপাশি ছিল, এই জন্য প্রাচীন লোকেরা ঐ দীঘী বল্লালের অন্তঃপুরস্থ দীঘী বলিয়া মনে করেন। দেবগ্রাম ও বিক্রমপুরের অনেক বনিয়াদী লোকের মুখে এই দীঘীর অপর নাম "বল্লাল-দীঘী" শুনা গিয়াছে। এই সাঁওতা হইতে দুইটী প্রাচীন জাঙ্গাল বা রাস্তা বাহির হইয়া একটী পশ্চিমদিক্ দিয়া বরাবর ভাগা, চাঁদপুর, বরগাছী হইয়া বিক্রমপুরের 'জিতের মাঠ' দিয়া যথাক্রমে ভবানীপুর, সুখপুকুর, রাজাপুর হইয়া বিল্বগ্রামের দক্ষিণ দিকে নবদ্বীপ অভিমুখে গিয়াছে। অপর জাঙ্গাল বা প্রাচীন রাস্তা পূর্ব্বদিক্ দিয়া চাঁদপুর, কালীনগর, ধুবী ও সেনপুর

বল্লালের ভিটা

বল্লালসেনের জাঙ্গাল

হইয়া ঘুনীর দক্ষিণ ও মালুমগাছার পার্শ্ব দিয়া গবীপুর পর্য্যন্ত গিয়া অদৃশ্য হইয়াছে। গবীপুরের প্রাচীন লোকেরা বলিয়া থাকেন যে, ঐ জাঙ্গাল পূর্ব্বে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, ক্রমে কৃষকগণের কৃপায় সে সমস্তই লুপ্ত হইয়াছে। উক্ত উভয় জাঙ্গালই 'রাজার জাঙ্গাল' বা 'বল্লাল-সেনের জাঙ্গাল' নামে স্থানীয় অধিবাসিগণের নিকট পরিচিত। ঐ জাঙ্গালের ধারে ধারে ৩.৪ ক্রোশ অন্তর বড় বড় পুরাতন পুষ্করিণী দেখা যায়, তন্মধ্যে সাঁওতা, ভাগা, বরগাছী, বিক্রমপুর, ভবানীপুর, রাজাপুর, বিল্বগ্রাম ও নবদ্বীপের পুষ্করিণী প্রসিদ্ধ। ভবানীপুর ও নবদ্বীপের পুষ্করিণী আজও "বল্লালের দীঘী" নামেই পরিচিত। আজও কেহ কেহ অপর স্থানের মজা পুকুরগুলিকে বল্লালসেনের নামের অপভ্রংশে 'বল্লামসেনের কীর্ত্তি' বলিয়া মনে করেন।

পূর্ব্বে এই স্থান বর্দ্ধমান জেলার কাঁটোয়া মহকুমার অধীন ছিল। প্রায় ৫০ বর্ষ হইল, কাঁটোয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ৺ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র মহাশয় কার্য্যগতিকে দেবগ্রামে আসিয়া কিছু দিন অবস্থান করেন। সেই সময় তিনি স্থানীয় জমিদার ৺বামনদাস মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সাহায্যে "বল্লালের ভিটা" খনন করাইয়াছিলেন। দেবগ্রামের প্রাচীন লোকেরা বলিয়া থাকেন — খননকালে ঐ স্তূপ হইতে বহুতর কাটা-পাথর, ভগ্ন পাথরের মূর্ত্তি (১৮ চিত্র দ্রষ্টব্য), ভাস্কর-কার্য্যযুক্ত পাথরের চৌকাট, পদ্ম ও নরনারী মূর্ত্তিযুক্ত পাথর (১৯।২০ চিত্র দ্রষ্টব্য), ৪।৫ হাত লম্বা পাথরের থাম (২১ চিত্র দ্রষ্টব্য), পাথরের মকরমুখ' নর্দ্দামা, দৈর্ঘ্যে তিন হাত ও প্রস্থে দুই হাত লিপিযুক্ত একখণ্ড প্রস্তরফলক এবং কটি হইতে জানু পর্য্যন্ত মালকোচা করিয়া কাপড়পরা মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল। ৺ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র মহাশয় লিপিযুক্ত প্রস্তরফলক ও কতকগুলি ভাঙ্গা মূর্ত্তি মিউজিয়মে পাঠাইবার জন্য কাঁটোয়ায় লইয়া যান। বামনদাস বাবু অনেক পাথর তাঁহার একডালার কাছারীতে পাঠাইয়া দেন। সে সময়ে এখানকার মডেল স্কুলের শিক্ষক ৺দীননাথ ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় তাঁহার স্বগ্রাম সালুগাঁ দোগাছিয়া গ্রামে এখান হইতে মকরমুখ' নর্দ্দামা ও কএকটী মূর্ত্তি লইয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত গ্রামস্থ নানা লোকে সেই সকল কাটা-পাথর স্ব স্ব গৃহে আনিয়া নানা কাজে ব্যবহার করিতেছেন। মালকোচা করিয়া কাপড়পরা ভগ্ন মূর্ত্তিটী বহু দিন কুলাইচণ্ডীতলায় পড়িয়াছিল। উহা ওজনে প্রায় ২ মণ হইবে, অনেক বলবান্ ব্যক্তি সেই ভগ্ন মূর্ত্তিটী তুলিয়া স্ব স্ব বলপরীক্ষা করিত। স্থানীয় লোকের নিকট তাহা "বল্লালসেনের বুক" বা "বল্লালসেনের ধড়" বলিয়া পরিচিত ছিল। কিছুদিন হইল বৈরামপুর গ্রামে সেই ধড়টী লইয়া গিয়াছে। এই ধড়টীর অনুসন্ধান আবশ্যক। এখনও "বল্লালের ভিটা" রীতিমত খনন করিলে অনেক পুরাকীর্ত্তি আবিষ্কৃত হইতে পারে। যখন 'বহরমপুর-রোড' প্রস্তুত হয় নাই, তখন এই ভিটার ধ্বংসাবশেষ সাঁওতার দীঘীর উত্তর পাড় হইতে আরম্ভ হইয়া বরাবর প্রায় অর্দ্ধ মাইল বিস্তৃত ছিল। এখনও ঐ অংশ খনন করিলেই মধ্যে মধ্যে পুরাতন ইট বাহির হয়। পূর্ব্বে এই সাঁওতার দীঘী প্রায় ৪০ বিঘা ছিল, ইহার উপর দিয়াই 'বহরমপুর-রোড' গিয়াছে, কিন্তু এখন ইহার অধিকাংশই শুষ্ক গোচারণ মাঠ হইয়া পড়িয়াছে। (২২ চিত্র দ্রষ্টব্য)।



২২। সাঁওতার দাবা (প্রবাদানুসারে বল্লালের অন্তঃপুর পুষ্করিণী)



১৯। বল্লালের ভিটা হইতে প্রাপ্ত পাথরের একধার



২০। বল্লালের ভিটা হইতে প্রাপ্ত পাথরের অপর ধার

বল্লালভিটার সংলগ্ন ডাঙ্গাপাড়ার পশ্চিমাংশে যে পুরাতন পুষ্করিণী আছে*, তাহার উত্তর পার্শ্বে দেবগ্রামের বয়োবৃদ্ধগণ ৪০ বর্ষ পূর্ব্বেও চারি হাত মোটা চৌকা থামের গোড়া দেখিয়াছিলেন, এখন তাহা চাপা পড়িয়াছে।

দেবগ্রামের প্রাচীন লোকের বিশ্বাস, সাঁওতার উচ্চ জমিতে পূর্ব্বকালে বহু লোকের বাস ছিল—নানা নৈসর্গিক কারণে ও মুসলমানবিপ্লবে তাঁহারা পূর্ব্ব স্থান ছাড়িয়া উত্তরে দেবকুণ্ড-তীরে আসিয়া বাস করেন।

বিক্রমপুর

বর্ত্তমান বিক্রমপুর গ্রাম দেবগ্রামের ৪ মাইল দক্ষিণে ও সোণাডাঙ্গা হইতে ১ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এই বিক্রমপুর প্রাচীন বিক্রমপুরের অংশমাত্র। এখানকার জমিদারের কাগজ হইতে জানা যায় যে, পার্শ্ববর্ত্তী বরগাছী, কালীনগর, বিক্রমপুরহাট†, বিক্রমপুরকুঠী প্রভৃতি স্থান বিক্রমপুর মৌজারই সামিল। দেবগ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী ডিঙ্গেলগ্রামের দক্ষিণে যে জোল বা নিম্নভূমি আছে, বিক্রমপুরের উত্তরপূর্ব্ব-সীমা ততদূর বিস্তৃত।

বিক্রমপুরের মধ্যে যে 'জাঙ্গীর খাল' আছে, সেই খাল দিয়া পূর্ব্বে ভাগীরথীর স্রোত বহিত। বর্ত্তমান বিক্রমপুরের পশ্চিমে একটী প্রকাণ্ড মাঠ আছে, উহার নাম 'জিতের মাঠ'। এখানে 'জিতের পুষ্করিণী' নামে একটী সুপ্রাচীন ও বৃহৎ পুষ্করিণী রহিয়াছে। প্রবাদ—উক্ত জিতের মাঠে বহু পূর্ব্বে সহর ছিল। পুষ্করিণীর নিকটবর্ত্তী স্থানে মৃত্তিকা মধ্যে এখনও লোকাবাসের যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। এখানে অল্প মাটী খুঁড়িলেই বহু পুরাতন লৌহমল এবং ভগ্ন মৃৎপাত্রাদি 'কুমারের সাজ' পাওয়া যায়। এই স্থান দেখিলেই মনে হইবে যে, বিলুপ্ত সহরের পূর্ব্ব দিয়া এক সময়ে ভাগীরথী প্রবাহিত ছিলেন। সম্ভবতঃ এই স্থানের প্রাচীন কীর্ত্তিরাজির সমস্তই ভাগীরথীর তরঙ্গে বিলুপ্ত হইয়াছে।

বর্ত্তমান বিক্রমপুরের ষষ্ঠীতলায় কএক খণ্ড পাথর পড়িয়া আছে, তন্মধ্যে একখানিতে সামান্য খোদাই কাজ আছে। সাঁওতার বল্লালের ভিটা হইতে যেরূপ কাটা-পাথর বাহির হইয়াছে—এখানকার পাথর সেই ধরণের। নিকটবর্ত্তী গবীপুরে প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। প্রবাদ—পুরাকালে এখানে এক রাজার বাড়ী ছিল।

বিক্রমপুরের পার্শ্ববর্ত্তী সেনপুর ও ঘূনীর মধ্যে অতিপ্রাচীন 'ট্যাংড়ার পুষ্করিণী' আছে। প্রবাদ—উহা বল্লালসেনের প্রতিষ্ঠিত।

'বল্লালসেনের জাঙ্গালের' কথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, তাহাও সাঁওতা হইতে আরম্ভ হইয়া এই বিক্রমপুরের মধ্য দিয়া গিয়াছে।

---

* অল্প দিন হইল গ্রামের কলুরা এই পুকুরের পঙ্কোদ্ধার করায় ইহার নাম 'কলুপুকুর' হইয়াছে।

† বর্ত্তমান বিক্রমপুর গ্রাম হইতে ১ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত।

পূর্ব্বেই রামচরিতের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি, গৌড়াধিপ রামপালের সময় বিক্রম নামে একজন পরাক্রান্ত রাজা দেবগ্রাম-প্রতিবদ্ধ-তরঙ্গবহুল-বালবলভী প্রদেশের অধিপতি ছিলেন। বর্ত্তমান বিক্রমপুরের তিন ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত অগ্রদ্বীপে শুনিয়া আসিয়াছি যে, বিক্রম নামে এক রাজা প্রত্যহ অগ্রদ্বীপে গঙ্গাস্নান করিতে আসিতেন। বর্দ্ধমানের নূতন গেজেটিয়ারেও লিখিত হইয়াছে যে, উজানি হইতে রাজা বিক্রমাদিত্য প্রত্যহ অগ্রদ্বীপে আসিয়া স্নান করিতেন। * পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, দেবগ্রাম ও বিক্রমপুর কাঁটোয়া মহকুমার মধ্যেই ছিল। বিক্রমপুর ও দেবগ্রামের প্রাচীন ভূসংস্থান ও ভাগীরথীর গতি হইতে বেশ মনে হইবে যে, বর্ত্তমান অগ্রদ্বীপের মত দেবগ্রাম এবং বিক্রমপুরও এক সময়ে ভাগীরথীর পশ্চিমে অর্থাৎ রাঢ়দেশের মধ্যেই ছিল। দেবগ্রাম-বিক্রমপুর হইতে মঙ্গলকোট পর্য্যন্ত প্রায় ১২ ক্রোশ ভূভাগ বিক্রম নামক নৃপতির শাসনাধীন থাকা কিছু বিচিত্র নহে। দেবগ্রাম-প্রতিবদ্ধ-বালবলভীপতি বিক্রমরাজই সম্ভবতঃ উজানি-মঙ্গলকোট, অগ্রদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের প্রবাদে বিক্রমকেশরী, বিক্রমাদিত্য বা বিক্রমজিৎ নামে পরিচিত হইয়া থাকিবেন। বর্ত্তমান বিক্রমপুরের পার্শ্বে যে সুবিস্তীর্ণ 'জিতের মাঠ' বা 'জিতের পুষ্করিণী' বিদ্যমান, তাহা 'বিক্রমজিতের মাঠ' বা 'বিক্রমজিতের পুষ্করিণী' শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ হওয়া অসম্ভব নহে। ইহার নিকট যে সুপ্রাচীন বিক্রমপুর সহর ছিল, তাহা যে রাজা বিক্রমজিতের প্রতিষ্ঠিত বা তাঁহার নামানুসারেই বিক্রমপুর নামে অভিহিত হইত, তাহাও অসম্ভব নহে।

বিক্রমপুরের প্রাচীনত্ব

বিজয়সেনের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে, তিনি বিক্রমপুরের প্রাসাদ হইতে 'শাসন' প্রদান করিতেছেন। এদিকে বল্লালসেনের সীতাহাটী-তাম্রশাসনে তৎপিতা বিজয়সেনের পরিচয়-প্রসঙ্গে নিবদ্ধ হইয়াছে—

"তস্মাদভূদখিলপার্থিবচক্রবর্ত্তী নির্ব্যাজবিক্রমতিরস্কৃত-**সাহসাঙ্কঃ**।
দিক্‌পালচক্রপুটভেদনগীতকীর্ত্তিঃ পৃথ্বীপতির্বিজয়সেনপদপ্রকাশঃ॥"

'তাঁহা (হেমন্তসেন) হইতে অখিল পার্থিব-চক্রবর্ত্তী পৃথ্বীপতি বিজয়সেন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অকপট বিক্রমে **সাহসাঙ্ক** অর্থাৎ বিক্রমাদিত্যকেও লজ্জিত করিয়াছিলেন এবং (দিক্)পালচক্রের নগরে তাঁহার কীর্ত্তি গীত হইত।'

অন্যত্র দেখাইয়াছি যে, একে একে পালরাজগণের সামন্তচক্র নষ্ট করিয়াই মহারাজ বিজয়সেনের অভ্যুদয় হইয়াছিল।† রামচরিতে দেবগ্রাম-বালবলভীপতি বিক্রমরাজও রামপালের

---

* Burdwan District Gazetteer by J. C. Peterson, 1913, p. 183. এখানে সাহেব ভ্রমক্রমে উজানিকে রাজপুতানায় লইয়া ফেলিয়াছেন। বর্দ্ধমান জেলার কাঁটোয়া মহকুমার অধীন উজানি-মঙ্গলকোটের বিক্রমাদিত্য বা বিক্রমজিৎই উক্ত প্রবাদের নায়ক বলিয়া বোধ হয়।

† বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, ৩০৪ পৃষ্ঠা।



২৩। বিক্রমপুরের প্রাচীন ভগ্ন দরগা

Printed by
K. V. Seyne & Bros.

সামন্তচক্র মধ্যেই কথিত হইয়াছেন। রাঢ়ের একাধিপত্য লাভের জন্য বিজয়সেনকে বিক্রম-রাজের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। এই বিক্রমরাজও এক জন অতিবিক্রমশালী নৃপতি ছিলেন বলিয়াই সম্ভবতঃ প্রশস্তিকার ভারতপ্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্যের সহিত তুল্যজ্ঞান করিয়া 'সাহসাঙ্ক'* নামেই পরিচিত করিয়া থাকিবেন। বিজয়সেনের প্রশস্তিসম্বলিত তাম্রশাসন বিক্রমপুরের রাজবাটী হইতে প্রদত্ত হইয়াছে। বল্লালসেনের তাম্রশাসনে 'দিক্‌পালচক্র-পুটভেদনগীতকীর্ত্তিঃ'-প্রসঙ্গে যেন তাহারই আভাস দেওয়া হইয়াছে।

বর্ত্তমান বিক্রমপুর গ্রাম হইতে প্রায় ৫৷৷০ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত সীতাহাটী গ্রামে ভূমি খননকালে বল্লালসেনের তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়। বল্লালসেন এই তাম্রশাসন লিখিয়া যে ভূভাগ দান করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত ভূভাগ সীতাহাটী হইতে বেশী দূর নয়।† এই তাম্রশাসনে লিখিত আছে—

"প্রৌঢ়াং রাঢ়ামকলিতচরৈর্ভূষয়ন্তোঽনুভাবৈঃ"—

অর্থাৎ যে সেনবংশ প্রৌঢ় রাঢ়দেশকে অতুল প্রভাব দ্বারা ভূষিত করিয়াছিলেন। সুতরাং বল্লালসেনের তাম্রশাসন হইতেই মনে হয় যে, রাঢ়দেশই সেনবংশের পূর্ব্বলীলাস্থল। এই তাম্রশাসনখানি "শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবার" হইতেই প্রদত্ত হইয়াছে।

পূর্ব্ববর্ণিত বল্লালের ভিটা, বল্লালের দীঘী ও বল্লালের জাঙ্গালসম্বন্ধীয় প্রবাদ এবং দেবগ্রাম-বিক্রমপুরের অবস্থান হইতে মনে হয় যে, বল্লালসেনের সীতাহাটী-তাম্রশাসনবর্ণিত "বিক্রমপুরজয়স্কন্ধাবার" বর্ত্তমান দেবগ্রাম বিক্রমপুরের মধ্যেই ছিল।

চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে রচিত আনন্দভট্টের বল্লালচরিতেও লিখিত আছে—বল্লালসেন কখন গৌড়ে, কখন বিক্রমপুরে এবং কখন স্বর্ণগ্রাম বা সুবর্ণগ্রামে অবস্থান করিতেন।‡ চারিশত বর্ষের এই প্রবাদ বাক্য হইতেও মনে হয় যে, বরেন্দ্রের মধ্যে গৌড় নগরে, রাঢ় দেশে বিক্রম-পুরে এবং বঙ্গদেশে সুবর্ণগ্রামে বল্লালসেন রাজকার্য্যোপলক্ষে সময় সময় অবস্থান করিতেন। বাঙ্গালার প্রায় সর্ব্বত্রই পূর্ব্বে যে যে স্থানে হিন্দুরাজের রাজধানী ছিল, আজকাল সেই সেই স্থানেই অধিকাংশ মুসলমানের বাস দেখা যায়। বর্ত্তমান বিক্রমপুর গ্রামে বা মৌজায় হিন্দুর বাস বেশী নাই, শতকরা ৯০ জন মুসলমান। কেবল ভাগীরথীর তরঙ্গাঘাত নহে—মুসলমান-

---

* জটাধরের সুপ্রাচীন সংস্কৃত কোষ অভিধানতন্ত্রে 'সাহসাঙ্ক' বিক্রমাদিত্যের নামান্তর বা পর্য্যায় বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

† সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সন ১৩১৭, ৪র্থ সংখ্যা, ২৩২ পৃষ্ঠা।

‡ "বসতিস্ম নৃপঃ শ্রীমান্ পুরা গৌড়ে পুরোত্তমে।
কদাচিদ্বা যথাকামং নগরে বিক্রমে পুরে ॥
স্বর্ণগ্রামে কদাচিদ্বা প্রাসাদে সুমনোহরে।
রমমাণঃ সহ স্ত্রীভির্দিবীব ত্রিদিবেশ্বরঃ ॥" বল্লালচরিত, ১ম অধ্যায়।

হস্তেও যে এখানকার সমুদয় হিন্দুকীর্ত্তি বিধ্বস্ত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান বিক্রমপুর গ্রাম ও বিক্রমপুর হাটের কতকগুলি পুরাতন ও ভগ্ন দরগাই (২৩ চিত্র দ্রষ্টব্য) পূর্ব্বতন মুসলমান-প্রভাবের প্রকৃষ্ট নিদর্শন।*

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

---

* দেবগ্রাম-বিক্রমপুরের পুরাতত্ত্ব উদ্ধারের বিশেষ চেষ্টা হইতেছে, সেই জন্ত এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিলাম না।